শ্রাবণ ১৩৮৪

আনন্দমেলা

ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে আসলের সঙ্গে সুদ মিলে টাকা বাড়ে
আমার টাকাও বাড়বে?
নিশ্চয়ই

ছোটদের সঞ্চয় পরিকল্পনায় ইউকোব্যাঙ্ক
এইল ছাত্র সঞ্চয়ব্যাঙ্ক এতে তোমরা....
বুঝেছি পয়সা জমাবো তারপর একদিন চিটিংফাঁকা
কত টাকা হবে আমাদের!

তাহলে আমার একটা ঘড়ি হবে
ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে চুরি যাওয়ার ভয় থাকেনা
মানে ওর মামার বাড়ীতে চুরি হয়েগেছে
আমার মামারা কি বোকা
আমার একটা সাইকেল হবে
আজই ইউকোব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে বলবে

ডিপোজিট সার্টিফিকেট কিনলে টাকা ৭ বছরে ডবল হয়ে যায়

টাকা কি করে তোলা যায়?
চেকে কিংবা স্লিপে

চলবে

আনন্দমেলা

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র,
বিজ্ঞপ্তি নং ৩৬৯ (১৬) টি-বি-সি ; তারিখ ১১ জানুয়ারি, ১৯৭৭

শ্রাবণ ১৩৮৪ জুলাই ১৯৭৭ ; তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা
দেড় টাকা

গল্প — সেই মানুষটি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ৫
ফুটবল আর ফুলকাকা। সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬

সত্যি গল্প — শহরে জোড়া বাঘ। গঙ্গেশ বিশ্বাস ১০

কবিতা ও ছড়া — এলেবেলে ছেলে। দিব্যেন্দু পালিত ৯
কাঁদিস কেন। গৌরী ধর্মপাল ৩৭
ছবির ব্যাপার। সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত ৪৪

উপন্যাস — বন্ধ ঘরের আওয়াজ। সমরেশ বসু ১৭
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ৩৮

বিশেষ রচনা — সমুদ্রের দৈত্য। সন্দীপ সরকার ২২
ব্যাঙের ছাতা। রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫

কমিক্‌স — নোলেদা। অহিভূষণ মালিক ৪, মেরু-রহস্য ১৪, টিনটিন ৩০, গাবলু ৪৫

লেখাপড়া — রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন ৩২
কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় ৩৩

খেলাধুলো — ইডেনে সোবার্স। সুব্রত সরকার ৪৬
অদ্বিতীয় আলি। চিরঞ্জীব ৪৮
বড় ফুটবলারদের কথা। মুকুল দত্ত ৪৯
রাতের ফুটবল। পুষ্পেন সরকার ৫০
টাকার খেলা ক্রিকেট। বজ্রসেন ৫১

ধাঁধা-মজা-রহস্য — আটখানা ২৮, ধাঁধা ২৮, কিসের ফটো ২৯, কিসের ছবি ২৯, শব্দ-সন্ধান ২৯

অন্যান্য লেখা — মজার পড়া। কুন্তক ১৩ ॥ তোমাদের পাতা ২১
আচ্ছা বলো তো। ভানুমতী ২৪ ॥ বিশ্ববিচিত্রা। দিদিমণি ২৪
মণিমেলার খবর ৪৪ ॥ ডোডো-তাতাই। তারাপদ রায় ৪৬
আঁকো। রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৪ ॥ শেখো। কারিগর ৫৪

রঙিন ছবি — তিমি ২২, ২৩ ॥ ব্যাঙের ছাতা ২৬, ২৭
ছোটদের আঁকা ৫৩ ॥ মোহনবাগানের মানস ভট্টাচার্য ৫৬

প্রচ্ছদ-চিত্র — দেবীপ্রসাদ সিংহ

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডএর পক্ষে বাপাদিত্য রায় কর্তৃক
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮
সি. আই. টি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

নাদুর দাপটে স্কুলে টেঁকাই দায় হয়ে উঠেছে ! কথায় কথায় একে তাকে ঠেঙিয়ে দেয়। সেদিন ছুটির পর বেচারা বেচারামের কী হালটাই না করল !

নোলেদার কাছে বেচার বক্সিং শিক্ষা শুরু হল...

সেই মানুষটি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আমার তখন তেরো বছর বয়েস, ক্লাস নাইনে পড়ি। সেবার শীতকালে পুরো আড়াই মাস আমরা ছিলাম মধুপুরে। আমার বাবার খুব অসুখ ছিল, সবাই বলেছিল, মধুপুরের জল-হাওয়ায় শরীর ভাল হয়ে যায়।

আমরা একটা মস্ত বড় বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। মধুপুরে তখন অনেক বাড়িই সারা বছর খালি পড়ে থাকত, খুব কম টাকায় অনেক বড়-বড় বাড়ি ভাড়া পাওয়া যেত।

আমাদের সেই বাড়িটার নাম ছিল "দীন কুটির"। দোতলা বাড়িটাতে অন্তত দশখানি ঘর, সামনে আর পেছনে বিরাট বাগান, তাতে অন্তত একশোটা আম আর পেয়ারা আর আতা গাছ। আমরা যখন খুশি গাছে উঠে পেয়ারা পাড়তাম, পেয়ারা-গুলোর ভেতরটা টুকটুকে গোলাপী রঙের। এমন একটা চমৎকার বিশাল বাড়ির নাম "দীন কুটির" ছিল বলে আমরা খুব মজা পেতাম।

ঘুম ভেঙে যেত খুব ভোরবেলা। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে বড় কাঁচের জানলা দিয়ে আলো এসে পড়ত চোখে, আর কতরকম পাখির ডাক! কলকাতায় তো এত রকম পাখির ডাক শোনা যায় না!

ঘুম থেকে উঠেই আমি একটা চাদর মুড়ি দিয়ে ছুটে চলে আসতাম বাগানে। যদিও খুব শীত, তবু ঘাসের ওপর দিয়ে খালি পায়ে হাঁটতে খুব আরাম লাগত। এক জায়গায় ছিল দশ-বারোটা গোলাপ ফুলের গাছ। সদ্য ফোটা গোলাপ ফুলের ওপর টলটল করে শিশির। ফুল না ছিঁড়ে, আমি মুখটা নিচু করে এনে একটা চোখ চেপে ধরতাম সেই গোলাপ ফুলের ওপর। কী দারুণ সুন্দর যে সেই স্পর্শ! তা ছাড়া সেই ভোরের শিশির লাগালে চোখ ভাল হয়।

একদিন ভোরবেলা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আমি একটা সাংঘাতিক দৃশ্য দেখতে পেলাম।

আমাদের বাড়িটার পেছন দিকের বাগানের পাঁচিল এক জায়গায় খানিকটা ভাঙা। পাঁচিলের ওপাশেই ধু-ধু করা মাঠ, দিগন্তের কাছে কয়েকটা ছোট ছোট পাহাড়। মাঠের মধ্যিখানে একটা সরু নদীও আছে।

আমি দেখলাম, আমাদের বাগানের মধ্যে, ভাঙা পাঁচিলের কাছেই একটা লোক পড়ে রয়েছে। লোকটার সারা গায়ে রক্ত মাখা। একটা খাকি ফুল প্যান্ট আর শার্ট পরা, সেগুলোতেও ছাপ-ছাপ রক্ত। মাটিতে শুয়ে আছে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে। চোট দুটো বোঝা।

দেখেই আমার বুক কাঁপতে লাগল। বইতে অনেক মারা-মারির গল্প পড়েছি। কিন্তু চোখের সামনে এরকম একটা মরা লোক আমি দেখিনি কখনো। ভয়ে আমি চিৎকারও করতে পারলাম না, সোজা ছুট দিলাম বাড়ির দিকে।

তখন মা শুধু ঘুম থেকে উঠেছিলেন। মা সকাল-সকাল ঘুম থেকে উঠে পাখিদের ছোলা খাওয়ান। আমাদের বাড়ির সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোলা ছিটিয়ে দিলেই কোথা থেকে এক ঝাঁক পায়রা উড়ে এসে বসে।

আমি মাকে জড়িয়ে ধরে বললাম, "মা মা, একটা লোক মরে পড়ে আছে...আমাদের বাগানে..."

মা আঁতকে উঠে বললেন, "সে কীরে? বলিস কী! কী সর্বনাশ!"

আমি এখন ছোট...

আমিও তো বড় হবো

বড় হ'য়ে বইটই প'ড়ে, লেখাপড়া শিখে আমিও বাবার মত কাজকর্ম করবো। আমার বাবাও তো ছোটবেলা থেকে তাই করেছে···আজ আমাদের বাড়ি···গাড়ি। দিদির মত আমিও কলেজে পড়বো। তারপর দিদির বিয়ে। সে কী মজা, কত হইচই। তারপর? তারপর আর আমি ভাবতে পারছি না।

আপনার ছেলের লেখা-পড়া, মেয়ের বিয়ে, নিজেদের অবসর-জীবনের সংস্থান··· এ সব কিছুরই ব্যবস্থা করার মত নতুন নতুন সঞ্চয় প্রকল্প আজ পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব পালন অনেক সহজ করেছে। আমাদের 'ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট' এই রকমই একটি সঞ্চয় প্রকল্প।

ফ্যামিলি বেনিফিট ডিপজিট প্রকল্প

★ মাসে ৫০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ২০,৯০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৩৮,৩০০৲।

★ মাসে ১০০ টাকা ক'রে জমালে ১৫ বছর পরে পাবেন ৪১,৮০০৲ অথবা ২০ বছর পরে ৭৬,৬০০৲।

এছাড়া এই প্রকল্পের অন্যান্য সঞ্চয়-ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণের জন্য যোগাযোগ করুন :

ইউনাইটেড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস : ৭, রেড ক্রশ প্লেস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

অথবা যে কোন শাখা অফিস।

চেয়ারম্যান : শ্রী জে. এন. বিশ্বাস

Progressive/UIB-32/77

তক্ষুনি আমার ছোটকাকাকে ডেকে তোলা হল। আমাদের চ্যাঁচামেচি শুনে মালিও ছুটে এল তার ঘর থেকে। মালি আর ছোটকাকাকে আমি সেই জায়গাটায় নিয়ে এলাম।

কিন্তু সেখানে সেই মৃতদেহটি নেই।

ছোটকাকা বললেন, "কোথায় গেল? কিছু নেই তো! তুই চোখে ভুল দেখিসনি তো?"

আমি বললাম, "না, ঠিক এই জায়গায় চিৎপাত হয়ে পড়ে ছিল। এই দ্যাখো না, মাটিতে রক্ত লেগে আছে।"

সত্যিই মাটিতে খানিকটা রক্ত। তা হলে লোকটা গেল কোথায়? লোকটা তা হলে মরেনি?

একটু খোঁজাখুঁজি করতেই দেখা গেল, একটা আতা গাছের নীচে বনতুলসীর ঝোপের মধ্যে উবু হয়ে বসে আছে একটা লোক। সেই খাকি প্যান্ট আর সাদা শার্ট পরা।

ছোটকাকা বললেন "নিশ্চয়ই কোনো চোর কিংবা ডাকাত! সাবধান, কাছে যাসনি!"

ছোটকাকা একটা বড় পাথর তুলে নিয়ে ঝোপের কাছে গিয়ে বললেন, "এই, বেরিয়ে আয় শিগগির! নইলে মাথা ফাটিয়ে দেব!"

ছোটকাকা ব্যায়াম করেন, খুব গায়ের জোর। লোকটা কোনো সাড়াশব্দ করল না দেখে ছোটকাকা পাথরটা উঁচিয়ে ধরে বললেন, "এই, মাথা ফাটিয়ে দিলাম কিন্তু, এখনো বেরিয়ে আয়!"

তখন লোকটা বলল, "মারবেন না, আমি চোর নই। আমি বেরুচ্ছি।"

প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল লোকটি।

ছোটকাকা বললেন, "আরে, এ তো দেখছি ভদ্দরলোক! তুমি মানে...আপনি ওখানে কী করছিলেন?"

লোকটির রং খুব ফর্সা, মাথায় কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল। মাথার বাঁ দিকে চুলে চাপ বেঁধে আছে রক্ত।

লোকটি উঠে দাঁড়াল না, বসে-বসেই খানিকটা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, "আমি কাল রাত্তিরে মাঠের মধ্যে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলাম...তারপর কয়েকটা কুকুর আমাকে তাড়া করে...খুব জোর কামড়ে দিয়েছে...এই বাগানে আশ্রয় নিতে এসে...পড়ে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম..."

ছোটকাকা বললেন, "কুকুর? মাঠের মধ্যে কুকুর? খুব জোর কামড়ে দিয়েছে? শেয়াল নয় তো? মালি, এখানে শেয়াল নেই?"

মালি বলল, "হাঁ, বহুত আছে!"

লোকটি বলল, "আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি একটু বাদেই চলে যাব। একটু জিরিয়ে নিচ্ছি।"

ছোটকাকা বললেন, "কেন, চলে যাবেন কেন? এই অবস্থায় যাবেন কী করে? চলুন, বাড়ির মধ্যে চলুন, ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিচ্ছি।"

লোকটি উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেও পারল না, ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল, তাড়াতাড়ি ছোটকাকা ধরে ফেললেন। তারপর মালি আর ছোটকাকা দুজনে মিলে প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে এনে লোকটিকে শুইয়ে দিলেন আমাদের বাইরের ঘরে।

মা চোখের ইশারায় আমাকে বাইরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে রে? আমাদের বাগানে কী করে এল?"

আমি বললাম, "তা জানি না। শেয়াল কামড়েছে।"

মা বললেন, "কী সাংঘাতিক কথা! কাদের ছেলে? রাত্তিরে মাঠে ঘুরছিল কেন?"

ছোটকাকা লোকটিকে বললেন, "দেখি, আপনার পায়ের কোন্ জায়গায় শেয়ালে কামড়েছে। প্যাণ্টটা গোটান।"

লোকটি বলল, "হাত দেবেন না, হাত দেবেন না! ভীষণ ব্যথা, এখন থাক।"

কিন্তু ছোটকাকা সে-কথা শুনলেন না। জোর করে রক্তমাখা প্যান্টটা গুটিয়ে ফেললেন। লোকটির পায়ে শেয়াল বা কুকুর কামড়াবার কোনো দাগ দেখা গেল না, কিন্তু বাঁ পায়ের গোড়ালিতে দুটো বড়-বড় কাঁচের টুকরো গেঁথে আছে। একটা টুকরো তো একেবারে ঢুকে গেছে ভেতরে। এখনো রক্ত বেরুচ্ছে সেখান থেকে।

দরজার কাছ থেকে মা বললেন, "ইশ!"

ছোটকাকা বললেন, "এ কাঁচ না বার করলে সেপটিক হয়ে যাবে। এক্ষুনি ডাক্তার ডাকা দরকার।"

লোকটি বলল, "না না, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। আমি নিজেই ঠিক করে নেব।"

ছোটকাকা বললেন, "তা কখনো হয়! এই নীলু, মাধবী কুঞ্জ বাড়িতে একজন ডাক্তারবাবু থাকেন, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।"

আমি তক্ষুনি ডাক্তারবাবুকে ডেকে আনার জন্য যাচ্ছিলাম, লোকটি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কড়া গলায় বলল, "না, ডাক্তার ডাকার দরকার নেই। একটু গরম জল পেলেই হবে।"

সে-কথায় আমি থেমে গেলাম।

মা বললেন, "গরম জল দিচ্ছি। কিন্তু তুমি মাঠের মধ্যে ঘুরছিলে কেন রাত্তিরে? তুমি কোথায় থাকো?"

লোকটি বলল, "আমি...ইয়ে...জসিডিতে থাকি।"

মা বললেন, "জসিডি? সে তো অনেক দূর। সেখান থেকে মধুপুরে এলে কী করে? হেঁটে আসছিলে?"

লোকটি বলল, "না, আমি এক্সপ্রেস ট্রেনে এসেছি মাঝ রাত্রে তারপর হেঁটে আসতে-আসতে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম..."

ছোটকাকা বললেন, "দেখি, মাথার কাছে কতটা কেটেছে?"

লোকটির কপালে হাত দিয়েই ছোটকাকা বললেন, "ইশ, আপনার যে সাঙ্ঘাতিক জ্বর এসেছে দেখছি! সেপটিক হয়ে গেলে এরকম জ্বর আসে..."

লোকটি বলল, "না, আমার সেপটিক হয়নি। আপনারা ভাববেন না..."

"আপনার নাম কী?"

"বিজন গুপ্ত।"

অতবড় বাড়িটার সব কটা ঘর আমাদের কাজে লাগত না। আমরা থাকতাম দোতলায়, একতলার ঘরগুলো খালিই পড়ে থাকে। সেই রকম একটা ঘরে বিছানা পেতে দেওয়া হল। একটা ছুরি আগুনে গরম করে তারপর নিজেই সেটা পায়ের মধ্যে ঢুকিয়ে বিজন গুপ্ত কাঁচ দুটো বার করলেন। তাঁর ভীষণ ব্যথা লাগছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তিনি একটুও চিৎকার করলেন না। গরম জলে রক্ত-টক্ত ধুয়ে পায়ে আর মাথায় দুটো ব্যান্ডেজ বেঁধে দিলেন ছোটকাকা। বিজন গুপ্তর চোখ দুটো লাল হয়ে গেছে, খুব জ্বর এসেছে বোঝা যায়।

আমাদের সকালের জলখাবার হয়েছিল লুচি আর হালুয়া। মা সেই এক প্লেট লুচি-হালুয়া আমার হাতে দিয়ে বললেন, "যা, ওই ছেলেটিকে দিয়ে আয়।"

আমি ওঁর ঘরে এসে দেখলাম, উনি ঘুমোচ্ছেন। দুবার ডাকলাম, কোনো সাড়া নেই। তারপর গায়ে একটু ধাক্কা দিতেই উনি চমকে প্রায় লাফিয়ে উঠে চিৎকার করে বললেন, "কে? কে?"

আমি বললাম, "আপনার খাবার।"

উনি বিরক্তভাবে বললেন, "খাব না।" তারপর আবার পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বাবা দোতলা থেকে নীচে নামেন না। তবু একসময় তাঁর কানেও কথাটা পৌঁছে গেল। বাবার ঘরে তখন একটা মীটিং বসে গেল। মা, ছোটকাকা, দিদি, ছোটকাকীমা—সবাই উপস্থিত।

বাবা বললেন, "জানা নেই শোনা নেই, একটা অচেনা লোককে তোমরা হুট করে বাড়িতে থাকতে দিলে?"

মা বললেন, "অসুস্থ হয়ে এসে পড়েছে, তাকে কি তাড়িয়ে দেওয়া যায়?"

"যদি চোর-ডাকাত হয়?"

"না না, ভদ্রলোকের ছেলে।"

"কী করে বুঝলে ভদ্রলোক?"

"তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়।"

"ছাই বোঝা যায়। কত চোর-ডাকাত আজকাল ভদ্রলোক সেজে ঘুরে বেড়ায়! তা ছাড়া ভদ্দরলোকের ছেলেরা বুঝি চুরি-ডাকাতি করে না? প্রায়ই তো দেখি কাগজে—"

"তা বলে একটা লোক অসুস্থ হয়ে এসে পড়লে তাকে তাড়িয়ে দেওয়া যায়?"

"আমাদের বাগানে এল কী করে?"

"কুকুরে না শেয়ালে যেন তাড়া করেছিল।"

"কিন্তু যাচ্ছিলটা কোথায়? কোন বাড়ির ছেলে, মধুপুরে চেনা কেউ আছে কি না, সে খোঁজ নিয়েছ?"

এবার ছোটকাকা বললেন, "তুমি কোনো চিন্তা করো না মেজদা। সে-সব খবর আমি বার করে নেব। কোনো বাজে মতলব থাকলে আমি ঠিক ঠান্ডা করে দেব ওকে।"

কিন্তু ছোটকাকাও খুব বেশী খবর আদায় করতে পারলেন না। বিকেবেলা বিজন গুপ্তর ঘুম ভেঙেছিল। ছোটকাকা তাঁকে এক কাপ চা দিয়ে নানারকম গল্প করতে লাগলেন। সেই সময় আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

বিজন গুপ্ত মধুপুরে কারুকে চেনেন না। তবে 'শিব নিবাস' নামে একটা খালি বাড়ির চাবি ওঁর কাছে আছে, উনি সেখানে যাচ্ছিলেন। 'শিব নিবাস' বাড়িটা যে কোথায় তা ছোট-কাকাও জানেন না, আমিও জানি না। জসিডিতে ওঁর বাড়ির লোকদেরও খবর দেবার দরকার নেই, তাঁরা কালই ফিরে গেছেন কলকাতায়।

ছোটকাকা বললেন, "কিন্তু আপনার এখনো জ্বর আছে।

পা-টা বেশ ফুলে গেছে। ডাক্তার দেখানো উচিত। ডাক্তার ডেকে আনব?"

উনি বললেন, "না না, কোনো দরকার নেই। আপনাদের আর কষ্ট দিতে চাই না। পা-টা একটু ঠিক হলেই আমি চলে যাব।"

বেরিয়ে এসে ছোটকাকা মা-কে ফিসফিস করে বললেন "চোর-ডাকাত হোক আর যাই হোক, ওর এখন এক পা-ও নড়বার ক্ষমতা নেই। তা হলে আর ভয়ের কী আছে? একটু সেরে উঠুক, তারপর ওকে আমি আরও জেরা করব!"

আমার বুকের মধ্যে দারুণ কৌতূহল জমে রইল। কোথা থেকে এল এই রহস্যময় লোকটি? আমিই একে আবিষ্কার করেছি। সত্যিই চোর কিংবা ডাকাত? আমি কোনো জলজ্যান্ত চোর বা ডাকাত আগে দেখিনি। কথা শুনে তো একদম কিছু বোঝা যায় না। ওঁকে যদি শেয়াল বা কুকুরে কামড়ে দেয়, তবে তার দাগ নেই কেন? কেন উনি ডাক্তার দেখাতে চান না? কেন বাড়ির লোককে খবর দিতে চান না? পা খোঁড়া হয়ে, জ্বর গায়ে কেউ অন্য লোকের বাড়িতে শুয়ে থাকে? কিন্তু আমারও খুব ইচ্ছে হল, একদিন আমি একদম অচেনা কারুর বাড়িতে খুব অসুখ নিয়ে আশ্রয় চাইব। আমাকে তারা চোর কিংবা ডাকাত ভেবে যদি সন্দেহ করে, তা হলে খুব মজা হবে।

আমাদের উল্টো দিকের বাড়ি 'অনন্ত ধামে' রোজ সকাল বিকেলে খুব কীর্তন হয়। বিখ্যাত কীর্তন-গায়ক গোবর্ধন ভট্টাচার্য তাঁর দলবল নিয়ে ওই বাড়িতে উঠেছেন। তাঁর সঙ্গে আমার বাবার চেনা আছে বলে তিনি রোজ একবার করে আমার বাবার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।

ছোটদের

স্বাস্থ্য, সুখ ও নিশ্চিন্ত জীবন
দ্রুত ফিরিয়ে আনতে আমরা
ওদের জন্য মধুর স্বাদের
ওষুধ তৈরি করে থাকি

Standard

স্ট্যাণ্ডার্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড

২৪, পার্ক স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৬

সেদিন সন্ধেবেলা গোবর্ধনকাকা খড়ম ঠকঠকিয়ে উঠে এলেন দোতলায়। গোবর্ধনকাকার গায়ে নামাবলী, মাথায় মস্তবড় টিকি। তাঁর ডান বাহুতে প্রায় একটা পানের ডিবের সাইজের রুপোর তাগা।

গোবর্ধনকাকা বাবার কাছে সব ঘটনা শুনে একেবারে আঁতকে উঠলেন। চোখ বড় বড় করে বললেন, "করেছেন কী? আজকাল কেউ অচেনা-অজানা লোককে বাড়িতে ঢোকায়? জানা-শুনো লোকেরাই কত রকম সর্বনাশ করে যায়! পায়ে চোট লেগেছে তো হাসপাতালে যাক!"

বাবা বললেন, "মধুপুরে হাসপাতাল আছে?"

গোবর্ধনকাকা বললেন, "তা হলে অন্তত থানায় খবর দেওয়া উচিত। জসিডিতে হাসপাতাল আছে, ট্রেনে চাপিয়ে দিলেই সেখানে চলে যেতে পারবে। আজকের কাগজ দেখেছেন?"

কলকাতার খবরের কাগজ একদিন দেরি করে আসে বলে গোবর্ধনকাকা হিন্দী কাগজ পড়েন। হাতের সেই কাগজটার এক জায়গায় আঙুল দিয়ে বললেন, "এই দেখুন!"

বাবা প্রাণপণে হিন্দী বুঝবার চেষ্টা করলেন। তখন গোবর্ধনকাকা নিজেই বলে দিলেন, "এই দেখুন, পরশু দেওঘরে এক বিরাট ডাকাতি হয়ে গেছে। সাত-আটজন লোক এক মারোয়াড়ীর বাড়িতে জোর করে ঢুকে সব কিছু নিয়ে চলে গেছে। এ ছেলে যে সেই ডাকাত দলের কেউ নয়, কী করে জানলেন?"

মা বললেন, "এ তো পরশুর কথা। ছেলেটি তো কাল রাত্রে ট্রেনে চড়ে এখানে এসেছে।"

গোবর্ধনকাকা বললেন, "সত্যি বলেছে না মিথ্যে বলেছে, তা কী করে বুঝলেন? কোথাও বোধহয় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ছিল একটা দিন। নিশ্চয়ই ডাকাতি করার সময় পাঁচিল টপকাতে গিয়ে পায়ে কাচ ফুটেছে।"

মা বললেন, "না, না, কাচ ফুটেছে আজ। পরশু কাচ ফুটলে কি তার থেকে আজও রক্ত বেরোয়?"

গোবর্ধনকাকা বললেন, "সে আপনারা বুঝে দেখুন!"

বাবা সব দোষ মায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে বললেন, "দেখুন না, উনি লোকটার মুখ দেখেই বুঝে গেছেন যে, সে ভদ্দরলোক, সে কোনো দোষ করতে পারে না!"

মা বললেন, "সে যা-ই হোক, কেউ অসুস্থ হয়ে এলে আমি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারি না। ছেলেটা মাটিতে পা ফেলতেই পারছে না, যাবে কী করে?"

নীচে নেমে এসে গোবর্ধনকাকা চোখের ইশারায় জিজ্ঞেস করলেন, সে কোথায়?

আমরা ঘরটা দেখিয়ে দিলাম। গোবর্ধনকাকা জানলা দিয়ে একবার উঁকি মেরেই ঠোঁট উল্টে মুখটা এমন বিকৃত করলেন যেন তিনি একটা খুব বিচ্ছিরি খারাপ জিনিস দেখেছেন। তারপর বললেন, "কোনো বিশ্বাস নেই!"

গোবর্ধনকাকাই পুলিসে খবর দিয়েছিলেন কিনা জানি না।

পরদিন ভোরবেলা তখনো আমি ছাড়া আর কেউ ঘুম থেকে ওঠেনি। আমি বাগানে গিয়ে একটা পেয়ারা গাছে উঠব কিনা ভাবছি, এমন সময় আমাদের গেটের সামনে একটা পুলিসের গাড়ি থামল। গেট খুলে দেবার জন্য কারুকে ডাকলও না, দু' জন পুলিশ টপ্ করে গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলতে এল।

আমি তক্ষুনি বুঝলাম, পুলিস বিজন গুপ্তকেই ধরতে আসছে। আমাদের বাড়িতে আগে কোনোদিন পুলিস আসেনি। তক্ষুনি তাঁকে সাবধান করে দেবার জন্য আমি বাড়ির মধ্যে দৌড়ে গেলাম।

কিন্তু বিজন গুপ্ত তাঁর ঘরে নেই। এত ভোরেই তিনি উঠে

পড়েছেন? বাথরুমের দরজাও তো খোলা। তা হলে কোথায় গেলেন? আমি গোটা একতলাটা খুঁজে দেখলাম। কোথাও পেলাম না। দোতলায় সব ঘরের দরজা বন্ধ। তখন আমি উঠে এলাম ছাদে।

ছাদে পাঁচিলের এক কোণে বসে আছেন বিজন গুপ্ত। এই শীতের মধ্যেও কপালে ঘাম। হাঁপাচ্ছেন। একটা পা সাঙ্ঘাতিক ফুলে গেছে। নিশ্চয়ই খুব ব্যথা। তবু এই পা নিয়ে তিনি কী করে ছাদ পর্যন্ত উঠে এলেন, সেটাই আশ্চর্য!

উত্তেজনায় আমার বুকের মধ্যে ধড়ফড় করছে। আমি ফিস-ফিস করে বললাম, "পুলিস এসেছে।"

উনি বললেন, "জানি!"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "পুলিস আপনাকে ধরতে এসেছে কেন? আপনি কী করেছেন?"

উনি দাঁতে দাঁত চেপে ভীষণ ব্যথা সহ্য করে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর একটুখানি দম নেবার পর বললেন, "শোনো খোকা, আমি চোর কিংবা ডাকাত নই। আমি একজন বিপ্লবী। এই কথাটার মানে তুমি বড় হয়ে বুঝবে।"

আমার গা ঝিমঝিম করে উঠল। বিপ্লবী কথাটার মানে তো আমি তখনই জানি। বিপ্লবী মানে যাঁরা দেশের জন্য কাজ করেন। দেশের মানুষের ভাল করবার জন্য যাঁরা অনেক কিছু বদলে দিতে চান। ইনি সেই রকম একজন লোক! ইনি ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করতে নেমেছেন!

তিনি ছাদের পাঁচিলের ওপর ওঠবার চেষ্টা করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কী করছেন?"

"আমি পালিয়ে যাচ্ছি।"

"কিন্তু আপনি পড়ে যাবেন যে! আপনার পায়ে ব্যথা!"

"আমি পড়ে যাই কিংবা মরে যাই, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু বিপ্লবীরা কক্ষনো ইচ্ছে করে ধরা দেয় না।"

তারপর জলের পাইপ বেয়ে উনি সরসর করে নেমে গেলেন নীচে। আমি মুখ ঝুঁকিয়ে দেখলাম, বাগানের মধ্য দিয়ে উনি এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে দৌড়চ্ছেন। ভাঙা পাঁচিলটার কাছে পৌঁছবার আগেই দু'জন পুলিস তাঁকে দেখতে পেয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাড়া করল। উনি এক লাফ দিয়ে পাঁচিলটা পার হয়ে চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

তারপর কী হল, আমি আর দেখতে পাইনি। পুলিস ও'কে ধরতে পেরেছিল কিনা আমি জানি না। আমার বাড়ির সব লোকের ধারণা, পুলিশ ও'কে ঠিকই ধরে ফেলেছিল। কিন্তু আমি সে কথা বিশ্বাস করিনি।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। বিজন গুপ্তর আর কোনো খবরই পাইনি। উনি কোথায় হারিয়ে গেছেন, কে জানে! আমার ছোটকাকা এখনো লোকজনের কাছে গল্প করেন, ওরে বাবা, সেবার মধুপুরে...একটা সাঙ্ঘাতিক ডাকাত...লুকিয়ে ছিল আমাদের বাড়িতে.....।

কিন্তু আমি জানি উনি ডাকাত নন। ও রকম বেপরোয়া সাহসী লোক আমি আর কখনো দেখিনি। এখনো তাঁর মুখটা আমার চোখের সামনে জ্বলজ্বল করে। আর কানে ভেসে আসে ও'র সেই শেষ কথাটা: "আমি পড়ে যাই কিংবা মরে যাই, তাতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু বিপ্লবীরা কক্ষনো ইচ্ছে করে ধরা দেয় না!" সেই সময় তাঁর গলার আওয়াজটা কী শান্ত আর গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।

কেন জানি না, এখনো সে-কথা মনে পড়লে আমার কান্না পেয়ে যায়।

ছবি / বুদ্ধাজিৎ সেনগুপ্ত

এলেবেলে ছেলে

দিব্যেন্দু পালিত

এলেবেলে ছেলেটার
মুখে নেই সাড়া—
যতোই বারণ করো
টো-টো করে পাড়া!
লাটাইয়ে সুতো নেই,
জুতো নেই পায়ে—
আঁকছে ঘুড়ির ছবি
দেয়ালের গায়ে।
এ-ঘুড়ি সে-ঘুড়ি নয়
যে-ঘুড়ি আকাশে
আনমনা রোদ্দুরে
এন্তার ভাসে।
লোকে ভাবে বোকাটার
মাথা জুড়ে পোকা;
বড়োই বেয়াড়া ছেলে,
বড়ো একরোখা!
পায় না কো খিদে তার,
পায় না কো ঘুম—
সারাদিন ধ'রে শুধু
কাটুম-কুটুম!
এটা তোলে ওটা ফেলে
সেটা নিয়ে ছেঁড়ে—
শুধু আলো-হাওয়া খেয়ে
কেউ ওঠে বেড়ে!
কিন্তু সে বাড়ে ঠিকই
আড়ে আবডালে—
চিক্‌চিক্‌ করে আলো
রুক্ষু কপালে।
যদি কেউ পিছু ডাকে,
নিচু ক'রে মাথা—
যায় চলে যদ্দুর
পথখানি পাতা।

ছবি/অহিভূষণ মালিক

শহরে জোড়া বাঘ

গঙ্গেশ বিশ্বাস

জঙ্গলে বাঘ থাকে কে না জানে। কিন্তু জঙ্গল ছেড়ে কোন ব্যাঘ্র-দম্পতি যে শহরে জায়গা দখল করতে এগিয়ে আসে, এমন খবর নিশ্চয়ই আশ্চর্যের। না, সার্কাস বা চিড়িয়াখানা বা রূপ-কথার বাঘেদের কথা নয়, সত্যিকার জঙ্গলের বাঘ-বাঘিনীই এই বাংলা দেশেরই এক শহরে এসেছিল আস্তানা গাড়তে।

পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। কিন্তু ঘটনাগুলো আজও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই। আমার বয়স তখন বছর দশেক।

বাবা মাথাভাঙা ডাকঘরের পোস্টমাস্টার। মাথাভাঙা তখন কোচবিহার রাজ্যের একটি মহকুমা শহর। বেঙ্গল ডুয়ার্স রেল-ওয়ের পাটগ্রাম স্টেশনে নেমে ভাঙা ইঁটের রাস্তা দিয়ে সেকালের হাটুরে বাসে নয়তো গরুর গাড়িতে যেতে হত সেখানে।

দুটি নদী শহরটিকে তিন দিকে ঘিরে থাকত। পুবে মানসাই, পশ্চিম আর দক্ষিণে সুটুঙ্গা। মানসাইয়ের প্রচণ্ড ভাঙনের জন্য এখন অবশ্য শহরটি সুটুঙ্গার দক্ষিণ-পশ্চিমে সরে যাচ্ছে। বর্ষায় নদীগুলো বেশ ফেঁপে উঠলেও শীতকালে সেগুলো পায়ে হেঁটেই পার হওয়া যেত। মানসাইয়ের ওপারে প্রথমে কাশ, কুল, পানিয়াল ও বাবলার ঝোপঝাড়, তারপর শাল ও সিসুর গভীর বন। এই বনের মধ্যে ছিল কোচবিহার সদর পর্যন্ত দো-আঁশ মাটির একটি অস্পষ্ট গরুর গাড়ির পথ। বল্লমের গলায় ঝুন-ঝুনি ঝুলিয়ে দুজন ডাকহরকরা সেই পথে মাথাভাঙার ডাক নিয়ে যেত কোচবিহারে। তারা বলত, "ঝুনঝুনির আওয়াজ শুনলে তেনারা বোঝেন আমরা সরকারের লোক, তাই গোলমাল না করে নিজেরাই পথ থেকে সরে যান।" তারা আবার বুঝিয়েও দিত 'তেনারা' মানে জঙ্গলের রাজা-জমিদার, বাঘ বাইসন—এই সব।

কোচবিহার রাজ্যের মহকুমা-শাসকের পদের নাম ছিল নায়েব আহিলকার। মাথাভাঙার নায়েব আহিলকার মাঝে মাঝে হাতি নিয়ে শিকারে যেতেন মানসাইয়ের ওপারে। আমাদের স্কুলের কাছেই ছিল নায়েব আহিলকারের জন্য স্টেটের বাংলো। হাকিমের বাসার ধারে যখন বাঘের ছাল ছাড়ানো হত, আমরা বিনা বাধায় বাঘের চর্বি নিয়ে আসতাম, আর তা গলিয়ে তৈরি করতাম বাঘের তেল। বেশ মনে পড়ে, এক দিন হাকিমবাবু একটা দাঁতাল শুয়োর মেরে এনেছিলেন; সেটা এত বড় ছিল যে, তার শরীরটা একলাই গরুর গাড়ির প্রায় সবটুকু জায়গা দখল করে নিয়েছিল।

মথাভাঙায় হাট হত সপ্তাহে দুদিন—বৃহস্পতি আর রবি-বার। একবার বৃহস্পতিবারের হাটের দিনে শহরে একটি বাইসন ঢুকে পড়ে বিস্তর তোলপাড় করেছিল, শুনেছিলাম ওখানকার বয়স্কদের মুখে। আমি সেখানে থাকাকালেও এক বৃহস্পতি-বারের যে-ঘটনার সক্ষী হয়ে আছি, তেমন ঘটনার কথা কেবল গল্পের বইয়েতেই দেখা যায়।

বাড়িতে তখন কার যেন অসুখ। সকাল আটটার দিকে ডাকঘরের সামনের রাস্তায় বেরিয়েছিলাম মানসাইয়ের এপারের একটি বাড়ি থেকে কিছু কবরেজী গাছ-গাছড়া জোগাড় করে আনতে। কিন্তু কেন জানি না উল্টো দিকের একটা পথ ধরে কিছু দূর চলে গিয়েছিলাম। দেখি লাঠি-ঠ্যাঙা হাতে নিয়ে লোকজন এক দিকে ছুটে চলেছে। ব্যাপার কী না-বুঝেই রাস্তার ধার থেকে একটা বাঁশের বাতা কুড়িয়ে নিয়ে আমিও ছুটলাম তাদের পিছু পিছু। আট-দশ মিনিট ছোটার পর যতীনবাবু-উকিলের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলাম। দেখলাম দলে দলে লোক উকিলবাবুর বাড়ির দিকে যাচ্ছে আসছে। বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে শুনতে পেলাম আশপাশের বাড়ির মেয়েদের কান্না কাটির শব্দ। যতীনবাবুর বাড়ির বেড়া পেরিয়ে ভেতরের দিকের উঠোনে যেতে যেতে দেখলাম তিনি খালি গায়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আসছেন। ফর্সা লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারা, এখন একে-বারে ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত। ভাবলাম, বুঝি একটা সাংঘাতিক মারামারি হয়ে গেছে তক্ষুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ভুল ভাঙল. বেড়া পার হয়ে ভেতরের উঠোনে পৌঁছে দেখলাম, একটা বড় চিতা বাঘ বা বাঘিনী, গায়ে প্রচুর কোপের দাগ নিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে মাটিতে পড়ে আছে। কিন্তু তখনও তার শরীরের কোন-কোন পেশীর স্পন্দন চলছে।

পাশেই ছিল আর-এক উকিল দীনবন্ধুবাবুর বাড়ি। লোকের পিছু পিছু সেই বাড়িতে গিয়ে দেখি, দীনবন্ধুবাবুও ভীষণ আহত। তিনি একটা বড় তুলোর স্তূপ ডান গালে চেপে ধরে খাটে শুয়ে আছেন, মেঝেতে একটা রক্ত-ভর্তি গামলা। পর পর আরও পাঁচ-সাত জন আহত ব্যক্তিকে দেখা গেল এই পাড়ায়। সকলেই ঘায়েল হয়েছেন বাঘের আক্রমণে। আমার হাতের বাতাটা যে কখন হাত থেকে খসে পড়েছে, টেরও পাইনি।

॥ ২ ॥

সম্পূর্ণ ঘটনার বর্ণনা দিতে গেলে একটা বই হুয়ে যায়। সংক্ষেপে ঘটনা হচ্ছে, আগের দিন রাত্রিতে ঐ পাড়াতেই একটু দূরের আর-এক উকিলের বাড়িতে কোথা থেকে যেন একটা বাঘ আর বাঘিনী ঢুকে পড়ে একটা খড়ের পালার পাশে চুপচাপ বসে ছিল। সময়টা শীতকাল। অনুমান করা যায় বাঘ দুটো

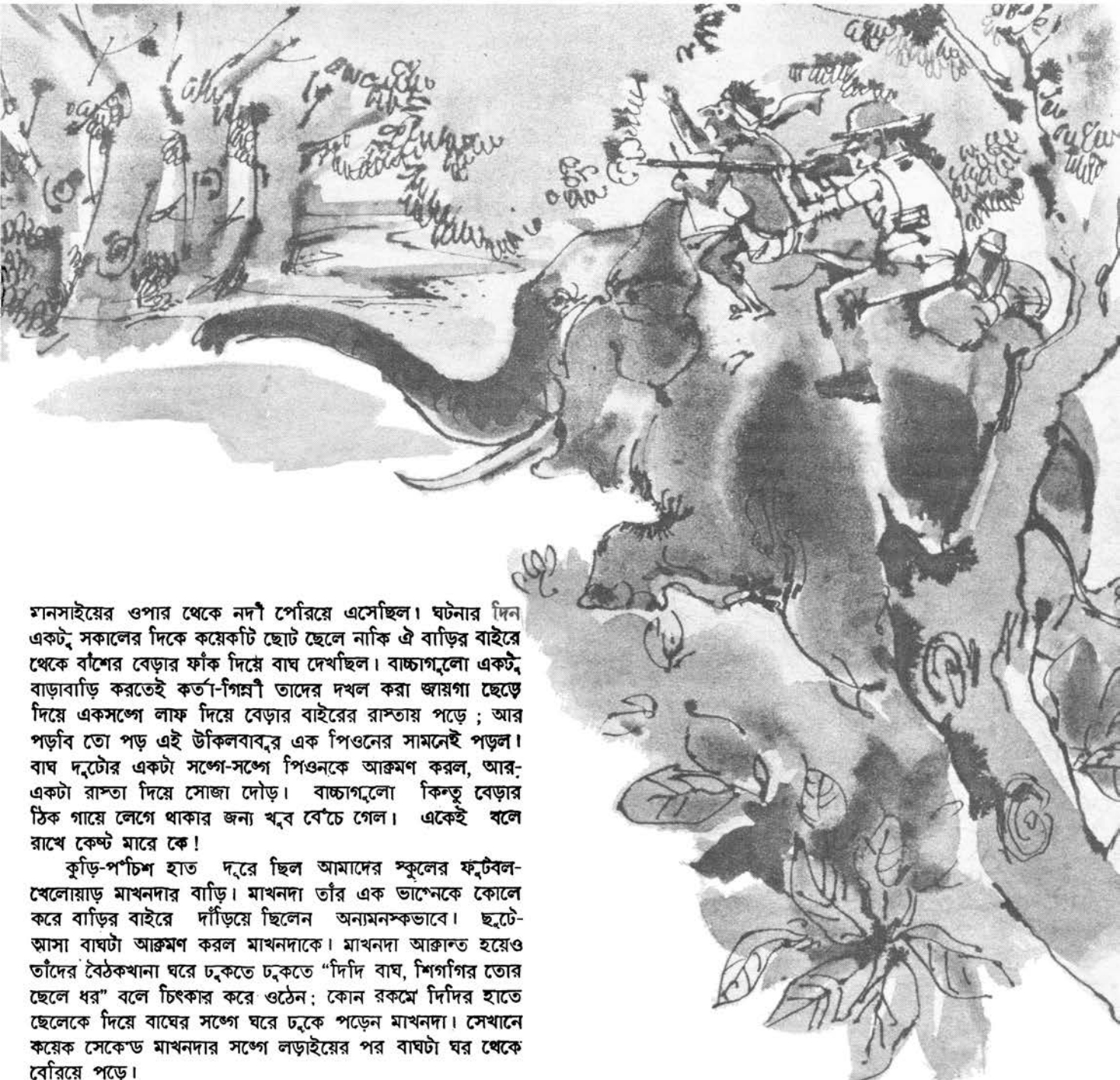

মানসাইয়ের ওপার থেকে নদী পেরিয়ে এসেছিল। ঘটনার দিন একটু সকালের দিকে কয়েকটি ছোট ছেলে নাকি ঐ বাড়ির বাইরে থেকে বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে বাঘ দেখছিল। বাচ্চাগুলো একটু বাড়াবাড়ি করতেই কর্তা-গিন্নী তাদের দখল করা জায়গা ছেড়ে দিয়ে একসঙ্গে লাফ দিয়ে বেড়ার বাইরের রাস্তায় পড়ে ; আর পড়বি তো পড় এই উকিলবাবুর এক পিওনের সামনেই পড়ল। বাঘ দুটোর একটা সঙ্গে-সঙ্গে পিওনকে আক্রমণ করল, আর একটা রাস্তা দিয়ে সোজা দৌড়। বাচ্চাগুলো কিন্তু বেড়ার ঠিক গায়ে লেগে থাকার জন্য খুব বেঁচে গেল। একেই বলে রাখে কেষ্ট মারে কে!

কুড়ি-পঁচিশ হাত দূরে ছিল আমাদের স্কুলের ফুটবল-খেলোয়াড় মাখনদার বাড়ি। মাখনদা তাঁর এক ভাগ্নেকে কোলে করে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন অন্যমনস্কভাবে। ছুটে-আসা বাঘটা আক্রমণ করল মাখনদাকে। মাখনদা আক্রান্ত হয়েও তাঁদের বৈঠকখানা ঘরে ঢুকতে ঢুকতে "দিদি বাঘ, শিগগির তোর ছেলে ধর" বলে চিৎকার করে ওঠেন; কোন রকমে দিদির হাতে ছেলেকে দিয়ে বাঘের সঙ্গে ঘরে ঢুকে পড়েন মাখনদা। সেখানে কয়েক সেকেণ্ড মাখনদার সঙ্গে লড়াইয়ের পর বাঘটা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

কিন্তু দুটো বাঘই অল্পক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। এদিকে পাড়ায় হৈ চৈ পড়ে যায়—বাঘ বাঘ! যারা দূর থেকে বাঘ দুটো দেখেছিল, তারা বলাবলি করছিল বাঘ দুটো কোন দিকে যেতে পারে। যতীনবাবু তখন তাঁর কাচারি-ঘরে মক্কেল নিয়ে ব্যস্ত। বাইরের উঠোনে দুজন মজুর কুড়ুল দিয়ে কাঠ চেরাই করছে। পাড়ায় হৈ চৈ শুরু হতে দীনবন্ধুবাবুও বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। পাশাপাশি দুই উকিলবাবুর বাড়ির মাঝে ছিল গলা-পর্যন্ত-বাঁশের-বেড়ায় ঘেরা কয়েক কাঠা পতিত জমি ভাঙ গাছে ভর্তি। দীনবন্ধুবাবু সেই ভাঙ গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ আঙুল দেখিয়ে বলে ওঠেন, "ওই যে বাঘ।"

এবারও শহরের জমি দখলে বাধা পেয়ে একটি বাঘ সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর ডান গালে মারে এক থাবড়া। তাতেই তাঁর ডান গালের অর্ধেকটা আলগা হয়ে যায়। দীনবন্ধুবাবুর এই দশা দেখে কাছেই দাঁড়ানো তার এক পিওন, রামখেলন, চিৎকার করে কেঁদে ওঠে, "বাবুকো তো খা লিয়া!"

বাঘ সেই মুহূর্তেই দীনবন্ধুবাবুকে ছেড়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে রামখেলনের কব্জি কামড়ে ধরে। এই সময় যতীনবাবু কাচারিঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তিনি কী করবেন স্থির করার আগেই বাঘটা রামখেলনকে ছেড়ে দিয়ে যতীনবাবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে।

যতীনবাবু ছিলেন বাঘা যতীনের মতই একজন শক্তিমান পুরুষ। বাঘ লাফিয়ে উঠতেই তিনিও তাকে জাপটে ধরেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কী ভাবে যেন বাঘটার মাথা চলে যায় তাঁর বগলের মধ্যে আর এই অবস্থায় তিনিও ধস্তাধস্তি করতে থাকেন বাঘটার সঙ্গে। মজুর দুজন এগিয়ে এসে মাঝে-মাঝেই বাঘটার গায়ে কুড়ুলের ঘা মারছিল বটে, কিন্তু জন্তুটার

অস্থিরতার জন্য খুব সুবিধাও করতে পারছিল না। এইভাবে কিছুক্ষণ—ক সেকেন্ড বা ক মিনিট বলা মুশকিল—চলার পর বাঘটা ছিটকে মাটিতে পড়ে যায়; কিন্তু দেখতে না দেখতে দাঁড়িয়ে উঠে আবার যতীনবাবুকে আক্রমণ করে। এবার যতীনবাবু দুহাত দিয়ে বাঘটার দুটো হাত চেপে ধরেন। মজুররা ইতিমধ্যে একটু দূরে সরে গিয়েছিল, তারা আবার এগিয়ে এসে কুড়ুল দিয়ে বাঘটাকে কোপাতে থাকে। এর পর বাঘটা যে পড়ল, আর উঠল না। এটা ছিল বাঘিনী, লেজ নিয়ে প্রায় সাত ফুট। দীনবন্ধুবাবুকে আক্রমণ করা থেকে বাঘটার মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা ঘটে যায় বোধহয় দশ মিনিট কি তারও কম সময়ে।

॥ ৩ ॥

বাঘিনীটা যখন দীনবন্ধুবাবুকে আক্রমণ করে, অন্য বাঘটা তখন ভাঙ-বাগান থেকে বেরিয়ে আর একটা পাড়ার মধ্য দিয়ে সোজা আধ মাইল দূরের একটা শুকনো খালের ঝোপ ঝাড়ের মধ্যে গা ঢাকা দেয়। শোনা যায়, বাঘটা যখন এই পাড়ার মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল, তার গায়ের ধাক্কা লেগে দু' তিন বছরের কয়েকটা বাচ্চা এদিক ওদিক ছিটকে পড়ে যায়।

দুপুরের দিকে বাঘটাকে মারার জন্য মাথাভাঙার হাকিম হাতি নিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই খালটার দিকে। ডাকঘরের কাছেই ছিল খালটার শেষ মাথা, শুরুটা ছিল মানসাই নদীর দিকে। খালের এক ধার বরাবর একটা রাস্তা চলে গিয়েছিল নদী পর্যন্ত, আর এক ধারে ছিল খ্রীষ্টান মিশনারিদের জংলা পতিত জমি। সময়ের হিসেব করে দেখলে দেখা যাবে, বাঘটা যখন খালের জঙ্গলে লুকিয়েছে, ঠিক তখনই ঐ খালের ধারের পথ দিয়ে আমাকে যেতে হত গাছ-গাছড়া আনতে। বাঘটা হয়তো তখন কোন ঝোপের আড়াল থেকে আমাকেই লক্ষ করত লেজ নাড়তে নাড়তে—ওরেব্‌-বাবা, এখন ভাবতেও যেন শিরদাঁড়া শিরশির করে!

হাকিম যখন হাতিতে মিশনারিদের দিক থেকে ধীরে ধীরে খালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, আমি তখন খালের মাথার ধারের একটা নিমগাছের উপরে উঠে খালের ভেতরের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম কী হয়। কতকগুলো গাছের আড়ালে পড়েছিল বলে আমি প্রথমে হাতিটা দেখতে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ পরপর দুটো বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার আওয়াজ পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দেখি একটা বাঘ বিদ্যুৎ-গতিতে একটা ঝোপ থেকে আর একটা ঝোপে গিয়ে ঢুকল। খাল-ধারের রাস্তায় তখন বোধহয় হাটের অর্ধেক লোক দাঁড়িয়ে। কিছু লোক খালের দিকে ছুটে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল বোধহয় হাতি থেকে কোন ইঙ্গিত পেয়েছিল তারা। এই সময় দেখা গেল হাতিটা খুব তাড়াতাড়ি খালের মধ্যে নামছে। তখনই আর একটা গুলির শব্দ পেলাম। এবার রাস্তার লোক আবার ছুটল খালের দিকে। বোঝা গেল প্রথম দুটো গুলি খেয়েও বাঘটা ছুটে যায় পরের ঝোপে; কিন্তু সেখানে পড়ে গিয়েও আবার উঠতে চেষ্টা করে। ঠিক সেই সময় চলে তিন নম্বর গুলি।

যখন দেখলাম, বাঘটাকে বাঁশে বেঁধে উপরে নিয়ে আসা হচ্ছে, তখন আমিও নিশ্চিন্তে গাছ থেকে নেমে এলাম কাছ থেকে বাঘ দেখতে। মনে হয় বাঘটা আট ফুটের কম ছিল না।

শেষ পর্যন্ত বাঘ-বাঘিনীর শহরে ঘর বাঁধার সাধ আর এ জীবনে মিটলই না।

ছবি / ঋত্বিজিৎ সেনগুপ্ত

ঝন্টু-মন্টুর গল্প (৯)

চিত্র–পরাগ রায়
বয়স–১১ বছর

আকার দেখে বোঝা

কুম্ভক

হাওয়ার কোনো আকার নেই তো, মা?

না।

আচ্ছা বলো তো, হাওয়াকে আকার দিলেই কোন্ খাবার জিনিস হয়ে যায়?

সে আবার কী? জানি না বাপু।

এও জানো না? বাতাসা, বাতাসা। বাতাসের শেষে আ-কার দিলে বাতাসা হবে না?

টুম্পির ধাঁধা শুনে আমি বলি ঃ বিদ্যাসাগর মশাইয়ের সেই গল্পটা শুনেছিস বুঝি?

কোন গল্পটা গো?

ওই যে একজন দুঃস্থ মানুষ সাহায্য চাইতে এসেছিলেন? এসে বললেন, 'আমার বড়ো দুরাবস্থা।' শুনে বিদ্যাসাগর মশাই বললেন, 'সে তো তোমার আকার দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' চেহারার কথাও বলা হলো, আবার দুরবস্থায় একটা বাড়তি আ-কার দেবার জন্যে বকে দেওয়াও হলো।

নন্তু বলল ঃ ওব্বাবা! বিদ্যাসাগরও বুঝি শিবরাম চক্রবর্তী ছিলেন?

টুম্পির ততক্ষণে অন্য সমস্যা শুরু হয়েছে। জিজ্ঞেস করল ঃ লোকটা কী করে বুঝবে যে দুরাবস্থা হবে না? সবাই কি আর ব্যাকরণ পড়েছে বলো?

না-ই পড়ল ব্যাকরণ। ও তো অবস্থার কথাই বলতে চাইছিল? দুঃখের অবস্থা, দুঃ অবস্থা, দুরবস্থা—এ তো একটু ভাবলেই বোঝা যায়। যায় না?

তা অবিশ্যি যায়।

এমনি করে শব্দগুলিকে একটু ভেঙে দেখলেই হয়। অকারণ আ-কারের হামলা কমে যাবে। বি অবস্থা ব্যবস্থা, বি অতিক্রম ব্যতিক্রম, বি অভিচার ব্যভিচার। আ আসবে কোত্থেকে?

অভিচার শব্দটা শুনতে বেশ।

শুনতে যত সুন্দর, মানেটা কিন্তু তত সুন্দর নয়। মানে কী, জানিস?

কী মানে?

মানে হলো, অন্যের ক্ষতি, অন্যের অনিষ্ট।

তাই? ইস! ও-রকম আরেকটা শব্দ আছে না, উপাচার?

উপাচার কেন হবে? উপচার। অভি হলো উপসর্গ, তার সঙ্গে মিলে অভিচার। বি উপসর্গ, হলো বিচার। তেমনি আ-চার প্র-চার উপ-চার। এসব শব্দে আ কেন লাগবে? তেমনি ধর্, ব্যর্থ ব্যবহার ব্যতীত ব্যবধান ব্যবচ্ছেদ...

এ কি 'ব্যা ব্যা ব্ল্যাক শিপ' পেয়েছ না কি? কেবলই ব-এ য-ফলা দিয়ে বলছ?

নন্তু বলল ঃ যা বলেছিস! একেবারে যেন গন্ডালিকা প্রবাহ!

গন্ডালিকা প্রবাহ? সেটা পেলি কোথায়? শব্দটা তো গন্ডল, যার থেকে হয় গাড়ল, মানে ভেড়া। তাহলে গন্ডলিকা হবে না? আ-কার দিলি কেন?

টুম্পি একটু নন্তুর পক্ষ নেয় এবার। বলে ঃ গন্ডল থেকে হয়েছে বলে গন্ডলিকা। আ-কার হবে না। তাহলে গন্ডল থেকে গাড়ল বললে কেন? গ-এ যে একটা আ-কার এল এবার?

সে হলো আরেকটা মজা। একে বলতে পারিস ক্ষতি-পূরণের মামলা। মাঝখানে ওই দুটো ড-এর একটা খসে গেল তো, তার বদলি চলে এল আগের ওই আ-কার। পরিষ্কার লেনদেন। এই রকম আরো কত হয় জানিস না? কর্ম কম্ম কাম। হস্ত হত্থ হাত। তেমনি, চন্দ্র থেকে চাঁদ, হংস থেকে হাঁস, পঙ্ক পাঁক, লক্ষ লাখ। বুঝতে পারছিস, কোথা থেকে আসছে আ?

উত্তর দিতে ভয় হচ্ছে। কোথায় আবার বাড়তি আ-কার দিয়ে বসব!

সন্দেহ যদি হয়, মনে মনে সন্ধিটা একটু ভেবে নিবি। অতি অধিক, তাই অত্যধিক; অনুমতি অনুসারে, তাই অনুমত্যনুসারে; জাতি অভিমান, জাত্যভিমান। অদ্য অপি থেকে অদ্যাপি হবে নিশ্চয়, তাই বলে যদ্যাপি তো নয়। যদি অপি, যদ্যপি।

তার মানে সন্ধিটাই সব?

সব নয়, তবে অনেকখানি তো বটে। বাকিটা দেখতে দেখতেই শিখে যাবি। যেমন ধর্, ত্রাস থেকে ত্রস্ত, ন্যাস থেকে ন্যস্ত। ব্যাস, কিন্তু ব্যস্ত। ব্যাপ্ত ব্যাপ্তি। ব্যক্ত ব্যক্তি। ব্যাধি, কিন্তু ব্যথা। একদিকে আয়, মানে আ-কার আছে। অন্য দিকে ব্যয়, মানে আ-কার নেই।

দাঁড়াও দাঁড়াও। এত কি মনে থাকে? টুকে নিই একটা খাতায়।

টুম্পি হেসে বলে ঃ ধন্যি ছেলের অধ্য—অধ্য,—এই রে, অধ্য না অধ্যা?

অধ্যবসায়, অধ্যবসায়! হেরে গেলি তো টুম্পি?

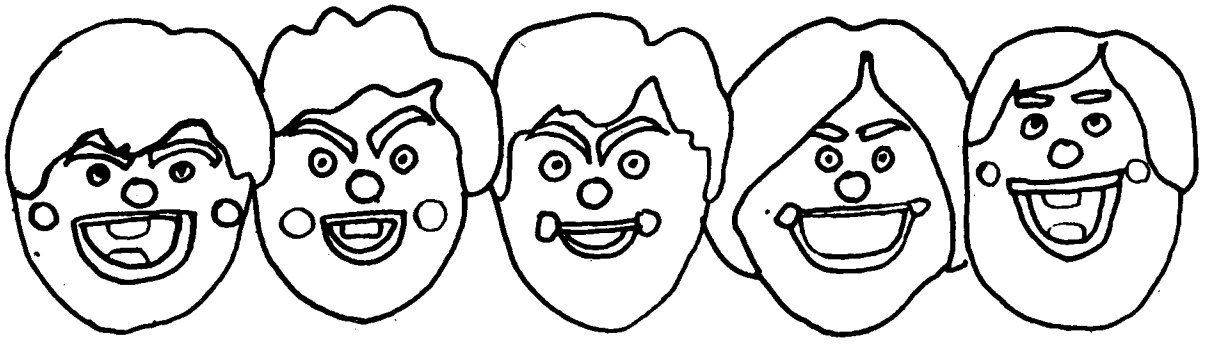

ভয়ংকর ওই পুরুতমশাইয়ের হাতে বন্দী হওয়ার চাইতে প্রাচীন এই গহ্বরের মধ্য দিয়ে সমুদ্রে পৌঁছনোর চেষ্টা করা অনেক ভাল—পলাতক ওই বন্দীরা ভাবল।
এই গহ্বরের ভিতর দিয়ে নীচের দিকে যাওয়া ছাড়া আমাদের আর কোনও রাস্তা নেই !

চারপাশে জমাট-বাঁধা লাভা .....
ভিতরে অদ্ভুত একটা গুহা.....
আর জলের শব্দও শোনা যাচ্ছে !

গুহার ভিতরে.....
গুপ্ত নদী ! এই জলপথেই তো আমরা তিমি-উপসাগরে পৌঁছতে পারব।

সংকীর্ণ ওই নদীপথে খুব সাবধানে ভাসতে ভাসতে এগোয় তারা.....হঠাৎ..... পায়ের তলায় থৈ মেলে না..... প্রবল এক স্রোত টেনে নিয়ে যায় তাদের.....

গুহাতলের ছোট্ট ঐ নদী ক্রমে ভয়ংকর এক স্রোতের আকার ধারণ করে, আর তাদের পাঁচজনকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তিমি-উপসাগরে.....
সাগরের অতিকায় জীব এরা !

প্রাণান্তকর চেষ্টায় তারা উঠল এসে ভাসমান এক তৃষারস্তূপের উপরে...ঠিক তক্ষুনি তেড়ে এল তিমি-উপসাগরের তিমি-মাছের দল.....
রাক্ষুসে তিমি সব !
1-5

আমাদের আক্রমণ করতে আসছে...সব্বাই টানটান হয়ে শুয়ে পড়ুন !

হঠাৎ রাইফেলের শব্দে গমগম করে ওঠে চতুর্দিক...তিমিটা ডুব দেয় জলের মধ্যে.. আর তাকে দেখা যায় না.....
রাইফেলের শব্দ ?
Distril

ভাসমান তষারস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে হতভম্ব হয়ে তারা দেখে, গুলি খেয়ে রাক্ষুসে তিমিটা ছুট পালাচ্ছে !
জখম হয়েছে এটা !

দেখুন ! আরও কতগুলো তেড়ে আসছে!

তক্ষুনি শোনা যায় পর পর গুলির ধ্বনি আর প্রতিধ্বনি...রাক্ষুসে তিমিগুলোও রণে ভঙ্গ দেয় ..
কে গুলি ছুঁড়ল ?
দেখুন !
দুম ! দুম ! দুম !

এ যে দেখছি ক্যাপ্টেন ব্রিউ !
ঐ তো হাইপেরিয়ন্ ! ভেঙেচুরে গেছে।

মহানন্দে একসঙ্গে মিললেন তাঁরা। ক্যাপ্টেন ব্রিউ বললেন, অকেজো এই উড়োজাহাজটিকে হয়তো বা তিনি চালু করতে পারবেন...
যদিও অনেকটা গ্যাস বেরিয়ে গেছে, তবুও আরও কিছুটা ওড়বার ক্ষমতা আছে এই উড়োজাহাজটার। আমার তো মনে হয় আমরা এটাকে ওড়াতে পারব।
কী করে ?

মোটরগুলো, গণ্ডোলা, আর যা কিছু ভারী জিনিসপত্তর আছে, সব নামিয়ে ফেলে এর ভার কমিয়ে ফেলতে হবে !
1-12
হ্যাঁ, তাহলে তো এটা একটা বেলুন হয়ে দাঁড়াবে...এর গতি নিয়ন্ত্রণ করব কীভাবে!

ঘাবড়াবেন না ! আমরা এমন একটা বাতাসের সাহায্য পাব, যা আমাদের ঠিক গ্রীনল্যান্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে !

প্রাণপণ চেষ্টা করে তাঁরা...অবশেষে...
আমরা উড়ছি !
এখন...শুধু বাতাস যদি আমাদের সহায় হয় !
Distributed by Ki
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

শিশুদের—কিশোরদের—যত ছোটদের বই

আকাদেমি পুরস্কারে সম্মানিত বিমল কর যা-ই লিখুন, নতুন ধরনের লেখেন। ছোটদের জন্যে তিনি এক রহস্যকাহিনী লিখেছেন—তাতে গোয়েন্দাও আছে, অপরাধও আছে, আছে এক দুর্ধর্ষ অপরাধীও। কিন্তু তারা সবাই-ই একেবারে অন্যরকমের; আর দশটা বইয়ের গোয়েন্দা বা অপরাধীর মতো একেবারেই নয়। এই 'আনন্দমেলা'তেই বেরিয়েছিল সেই আশ্চর্য গল্প—'কাপালিকরা এখনও আছে'। যারা একটু একটু করে মাসে মাসে পড়েছ, তারা এখন একসঙ্গে দু মলাটের মধ্যে পেয়ে যাচ্ছ পুরো গল্পটা। একবারে পড়লে দেখবে, ওই পড়া গল্পই আরও কত ভাল লাগছে। আর, যাদের কোনও কারণে পড়া হয়ে ওঠেনি, তারা যদি পড়—সে আর বলতে হবে না! একবার পড়েই দেখ না!

বিমল কর
কাপালিকরা এখনও আছে ৭.০০
ওআওার মামা ৬.০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও ময়ূখ চৌধুরী
নিশীথ রাতের আহ্বান ৩.০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩.০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫.০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪.০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪.০০
রসায়নের ভেল্‌কি ৩.০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭.০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩.০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪.০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬.০০
বাজনা ৫.০০
হপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫.০০
আমার নাম টায়রা ৫.০০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬.০০

নকুল মুখোপাধ্যায়
দেবতার পাহাড় ৩.০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫.০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৪.৫০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫.০০
পাপুর বই ৬.০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫.০০
পাথরের চোখ ৬.০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬.০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪.০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেবেলা ৫.০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৪.০০
সত্যি রাজপুত্র ৫.০০
তিন নম্বর চোখ ৫.০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘন্টাদার কাবলু কাকা ৫.০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬.০০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪.০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪.০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪.০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫.০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশু সাহিত্য ১০.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫.০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০.০০
জীবজন্তু ৮.০০

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫.০০
এক ডজন গপ্‌পো ৮.০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫.০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫.০০
সোনার কেল্লা ৬.০০
বাক্স-রহস্য ৫.০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫.০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬.০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫.০০
আরো এক ডজন ১০.০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২.০০

সরলাবালা সরকার
পিন্‌কুর ডাইরি ২.০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬.০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার বুক ৪.০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪.০০

অমরনাথ রায়
দেশ বিদেশের বিজ্ঞানী ১০.০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪.০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫.০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩.০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ি ৪.০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

বন্ধ ঘরের আওয়াজ

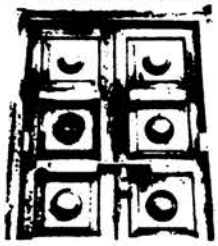

সমরেশ বসু

[এর আগের সংখ্যায় গোগোলের পুরনো কিছু ঘটনার সংগে, আজ বিকেলে ও যখন ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরল, তখনকার ঘটনা দিয়ে শুরু। গোগোল আজ ইস্কুল থেকে এসেই মায়ের কাছে শুনল, সাততলার ডাবুদা, যে-ক্লাশ এইট-এ পড়ে, আর বেশ বড়লোকের ছেলে, সে নাকি গতকাল ইস্কুলে গিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। গোগোল ডাবুকে ডাবুদা বলে। ওর বয়সী সব ছেলেই বলে। ডাবুদার বয়স প্রায় চোদ্দ। গোগোল ক্লাস-থ্রিতে পড়ে, বয়স প্রায় দশ। ইদানীং ওর দাঁত পড়তে আরম্ভ করেছে। ডাবুদা গতকাল ইস্কুলে গিয়ে আজ বিকেল পর্যন্ত বাড়ি ফেরেনি শুনে, গোগোল ভীষণ উত্তেজিত হয়ে নানারকম ভাবনা শুরু করে দিল। মা ওকে সাবধান করে দিলেন, ও যেন আজ বাড়ির নীচের চত্বর ছেড়ে কোথাও না যায়।

গোগোল খেতে-খেতেই দেখল, ডাবুদার বাবা, আর পুলিস গাড়ি নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চত্বরে ঢুকলেন। আর চত্বরে তখন ওর বন্ধুরা, সুমিত, টুকাই, পাঞ্জাবি বন্ধু গোগে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান বন্ধু জর্জ আর পারভেজ্। গোগোলের খাওয়া তখন মাথায় উঠে গিয়েছে। মাকে লুকিয়ে ও এক পিস্ মাখন-টোস্ট পকেটেই পুরে ফেলল, আর মাকে বলে, বাইরে গিয়ে লিফ্টের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবনায় পড়ে গেল, নীচে যাবে, না ওপরে সাততলায় ডাবুদার ফ্ল্যাটে যাবে।]

২

লিফ্টের সামনে দাঁড়িয়ে গোগোল দোটানায় পড়ে গেল। ওর খুব ইচ্ছে করছে, সাততলায় ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে যায়। সেখানে ওয়্যারলেস লাগানো জীপে পুলিস অফিসার এসেছেন। ডাবুদার খোঁজ-খবরের ব্যাপারে কী কথাবার্তা হচ্ছে তা শোনবার জন্য ওর মনটা ছটফট করছে। কিন্তু ওর যাওয়াটা ঠিক হবে কি না, বুঝতে পারছে না। বড়রা তাঁদের কথাবার্তার মাঝখানে, ছোটদের থাকাটা মোটেই পছন্দ করেন না। অথচ এটা হল ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার ঘটনা। একটু আগেই মায়ের সংগে কথা হচ্ছিল, খবরের কাগজে আজকাল কী ভয়ংকর সব খবর বেরোয়। ডাবুদার বাবা সারা দিন গাড়ি নিয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর তার মা-দিদিরা কান্নাকাটি করছেন। পুলিস অফিসার কী খবর নিয়ে এলেন, সে-কথা শোনবার জন্যই গোগোলের এখন এত ছটফটানি।

গোগোল দেখছিল, লিফ্টের মাথায় সাত নম্বরটা লাল আলোয় জ্বলজ্বল করছে। যার মানে, লিফ্ট সাততলায় দাঁড়িয়ে আছে। গোগোল আর থাকতে পারল না। ঠিক করল, সাততলাতেই যাবে। এই ভেবে যেমনি ও লিফ্টের বোতামে হাত দিয়েছে, অমনি সাত নম্বরটা মুছে ছ' নম্বরে এসে থামল। একটু থেমে থেকেই আবার নীচে নেমে এল। নিশ্চয়ই ডাবুদার বাবা আর পুলিস অফিসার নেমে আসছেন? গোগোল বড় বড় চোখ করে লিফ্টের নেমে আসা রোপের দিকে তাকিয়ে রইল।

লিফ্ট হুশ্ করে নেমে এল পাঁচতলায়,আর না থেমেই নীচে নেমে গেল। কিন্তু ডাবুদার বাবা বা পুলিস অফিসার কেউ-ই লিফ্টের খাঁচার মধ্যে ছিলেন না। একদম অচেনা একটা লোক, একলা নেমে গেল। হয়তো একদম অচেনা নাও হতে পারে। তাড়াতাড়ির জন্যই গোগোল হয়তো লোকটাকে চিনতে পারল না। এই আটতলা বাড়ির হরেক ফ্ল্যাটে যারা কাজ করে, আর গাড়ি চালায়, তাদের প্রায় সবাইকেই ও চেনে। মুখচেনা সকলেই। কিন্তু বাইরের লোকও তো অনেক সময় নানান ফ্ল্যাটে যাতায়াত করে।

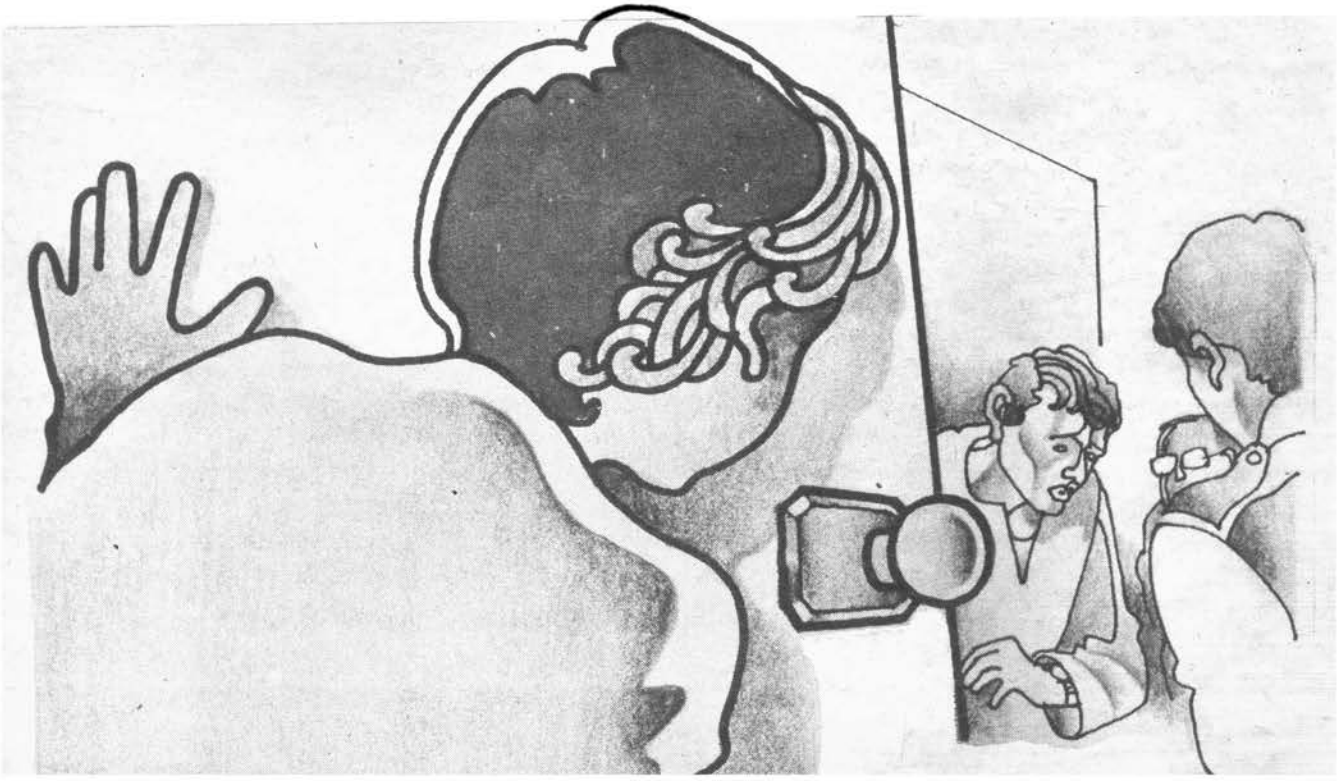

আত্মীয়-স্বজন-অতিথিরা আসেন। গোগোলের পক্ষে সবাইকে চেনা সম্ভব নয়। আর প্রত্যেক তলায় চারটে করে ছোট-বড় ফ্ল্যাট আছে।

গোগোলের মনে হল, যে-লোকটা এইমাত্র লিফ্‌টে করে নেমে গেল, তার পোশাক-আশাক অনেকটা যেন ড্রাইভারের মতো। বাবার অফিসের গাড়ির ড্রাইভারের মতো এ-লোকটার কোনো ইউনিফর্ম পরা ছিল না। সাদা-কালো ডোরা-কাটা হাফ-হাতা শার্ট আর কালো রঙের ট্রাউজার। গোগোল তাড়াতাড়ির মধ্যেও ঠিক দেখেছিল, আর অনেকক্ষণ গাড়ি চালিয়ে হাওয়ায় উড়ে চুল যেমন উসকো খুসকো হয়ে যায়, জামা-প্যান্ট একটু ময়লা-ময়লা দেখায় লোকটাকে সেই রকমই দেখাচ্ছিল। লিফট নামবার সময় প্রথমেই লোকটার পায়ে স্যান্ডেল দেখতে পেয়েছিল। মোটা সোলের ময়লা স্যান্ডেল। মোটেই ঝকঝক করছিল না। যে-কারণে গোগোলের মনে হল, হয়তো লোকটা ড্রাইভার হতে পারে।

লিফ্‌ট নামবার সময় লোকটার সঙ্গে গোগোলের এক সেকেণ্ডের জন্য চোখাচোখিও হল। লোকটার চোখ দুটো যেন জ্বল্‌জ্বল্‌ করছিল। বয়স তিতুদার মতই হবে। তিতুদা গোগোলের জ্যাঠতুতো দাদা, লেকটাউনে থাকে। তিতুদা ডাক্তারি পাশ করেছে, এখন হসপিটালে হাউস সার্জন হয়ে আছে। লোকটাকে দেখে তিতুদার কথা মনে পড়ে গেল, কারণ তিতুদার যেমন লম্বা-চওড়া একজোড়া গোঁফ আছে, লোকটারও সেই রকম আছে। লোকটার চেহারাও তিতুদার মতো লম্বা, কিন্তু তিতুদার মতো দেখতে সুন্দর নয়।

লোকটাকে নিয়ে গোগোলের এত ভাববার কোনো কারণ ছিল না। কিন্তু ওর মনটাই এমন, কারও মুখের দিকে এক পলক দেখলেই ও যেন তার মনের ভাব বুঝে নিতে পারে। লোকটার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়েই কেমন মনে হল, সে ভয় পেয়ে লুকোচ্ছে বা পালাচ্ছে। লোকটার ভেতরে যেন খুব তাড়াহুড়ো লেগেছে। অবিশ্যি এসব ভাববার কোনোই মানে হয় না। ভদ্রলোক হয়তো ডাবুদাদেরই কেউ হবেন, ওর তিতুদার মতো কোনো দাদা বা আর কেউ। ডাবুদার হারিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ভয়ে মুষড়ে পড়েছেন।

গোগোল মনে মনে ঠিক করে ফেলল, ও সাততলাতেই যাবে। ডাবুদার ফ্ল্যাটে একবার উঁকি দিতেই হবে। ডাবুদার বাবা আর পুলিস কোনো খবর পেয়েছেন কি না, জানার জন্যে ওর মন খুবই অস্থির হয়ে উঠেছে। মা জানতে পারলে হয়তো রাগ করবেন। আর এ-বাড়ির নীচের চত্বরে বন্ধুদের জন্যও ওর মন টানছে। কিন্তু একবারটি ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে যেতেই হবে। মাসীমা, মানে ডাবুদার মা, আর দিদিদের দেখবার জন্যও ওর মন বেশ উতলা হয়েছে।

গোগোল লিফ্‌টের বোতামে আঙুল টিপল। কিন্তু লিফ্‌ট তখন ওপরে উঠতে আরম্ভ করেছে। ও আরও দু'বার বোতাম টিপে দিল, যেন লিফ্‌ট পাঁচতলায় দাঁড়ায়। লিফ্‌ট উঠে এল আর ওর সামনেই দাঁড়িয়ে গেল। গোগোল দেখল, পাঁচতলার অন্য ফ্ল্যাটের বুলাদি আর তার বর লিফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এল। বুলাদির বরের কোলে ছেলে। আরও এক ভদ্রলোক নেমে এলেন, নাম ইউসুফ সাহেব। পারভেজের বাবা। পারভেজরাও পাঁচতলারই অন্য ফ্ল্যাটে থাকে। ইউসুফ চলে যাবার পরে, বুলাদি জিজ্ঞেস করল, "গোগোল, তুই কোথায় যাবি?"

বুলাদি আর তার বর হয়তো ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। নয়তো ছেলেকে ডাক্তার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল। ছেলের গায়ে মশার কামড়ের মতো লাল-লাল অনেকগুলো গোটা বেরিয়েছে। কিন্তু বুলদিকে কি বলা ঠিক হবে, ও এখন ডাবুদাদের ফ্ল্যাটে সাততলায় যাচ্ছে? হয়তো এখুনি গিয়ে মাকে বলে দেবে। বুলাদি তো প্রায়ই মার কাছে যায়। তাছাড়া, আর একটা ব্যাপার হল, গোগোলের বয়সী ছেলেদের একলা লিফটে উঠে ওঠানামা বারণ। একজন বুড়ো লিফটম্যান আছে। সে সব সময় থাকে না। গোগোলদের তাই ওঠানামার সময় বড়দের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। নয়তো সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হয়। ছোটদের নাকি সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু লিফটে চেপে ওঠানামার একটা মজা আছে। বিশেষ করে একলা। গোগোল এখন অনায়াসেই লিফটের দরজা বন্ধ করতে পারে, ভেতরের বোতামগুলোর নাগালও পায়। তবুও বারণ, কারণ হঠাৎ যদি লোডশেডিং হয়ে যায়? তাহলে কোথায় আটকে পড়বে, কে জানে। এরকম ঘটনা অনেক ঘটে।

বুলাদির কথায় গোগোল ঢোঁক গিলে বলল, "আমি নীচে খেলতে যাচ্ছি।"

বুলাদি আর তার বর গোগোলকে খুবই ভালবাসে। কিন্তু একলা লিফ্‌টে চাপতে দেবে না কিছুতেই। বুলাদি দেখতে খুব সুন্দর, সব সময়েই হাসিখুশি। তা বলে, এখন খাতির করল না, বলল, "তা তুই লিফ্‌টের সামনে দাঁড়িয়ে কেন? সিঁড়ি দিয়ে নেমে যা। কেউ তো নেই এখন লিফ্‌টে।"

গোগোল ভাল ছেলের মতো ঘাড় কাত করে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। দু ধাপ নেমেই লিফ্‌টের দরজা বন্ধ হবার শব্দ শুনতে পেল। আবার দু ধাপ উঠে এসে উঁকি দিয়ে দেখল, বুলাদি তার বরের সঙ্গে বাঁ দিকের আড়ালে চলে গেল। গোগোল এখন লিফ্‌টে ওঠার জন্য ব্যস্ত নয়। ভেবেছিল চট করে সকলের চোখ ফাঁকি দিয়ে সাততলায় উঠে যাবে। কিন্তু ও আর সে চেষ্টা করল না। সিঁড়ি দিয়েই দৌড়ে একটুও না-থেমে একেবারে সাততলায় উঠে গেল। দাঁড়াল গিয়ে ডাবুদাদের দরজায়।

ডাবুদাদের বাইরের ঘরের দরজাটা খোলাই ছিল। দেখা গেল, কলকাতা পুলিসের পোশাক পরা দুজন অফিসার বসে আছেন। ডাবুদার বাবা নীহাররঞ্জনবাবু আর মাসীমাও তাঁদের সামনেই একটা সোফায় বসে আছেন। মেসোমশাইয়ের, মানে, ডাবুদার বাবার, মুখটা কেমন শুকনো। মাথার পাতলা চুলগুলো উশকোখুশকো। আর মাসীমা তাঁর কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ মুছলেন। তার মানে, কাঁদছেন? তার মানে, ডাবুদার কোনো খারাপ খবর পাওয়া গিয়েছে?

গোগোল স্থির থাকতে পারল না। দরজার কাছে এগিয়ে গেল। দেখল, ডাবুদার দিদিরা—মীনাদি আর রিনাদি, দুজনেই খাবার ঘরের কাঠের পার্টিশনের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনেই কাঁদছে, আর দুজনেই মুখে হাত চেপে আছে। তার মানে নিশ্চয়ই কোনো খারাপ খবর এসেছে।

এই সময় একজন অফিসার গোগোলের দিকে তাকালেন। তাঁর দেখাদেখি ডাবুদার বাবাও দরজার সামনে গোগোলের দিকে তাকালেন। কাঁদলে যেমন চোখ লাল হয়, তাঁর চোখ দুটো সেইরকম লাল। এত বড় ফ্ল্যাটবাড়িতে গোগোলের বয়সী সব ছেলেকে তাঁর পক্ষে চেনা সম্ভব নয়।। কিন্তু উনি গোগোলের দিকে মোটেই বিরক্ত চোখে তাকালেন না। বরং মনে হল, গোগোলের দিকে তাকিয়েও, উনি যেন গোগোলকে দেখছেন না। পুলিস অফিসারই জিজ্ঞেস করলেন, "কী খোকা, কী চাই?"

গোগোল বেশ ঘাবড়িয়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে জানাল, কিছু চায় না। তখনই ওর ওপরে মীনা আর রিনাদির চোখ পড়ল। মীনাদি কান্না-কান্না গলায় বলল, "কী রে গোগোল, কিছু বলবি?"

গোগোল আর-কোনোদিকে না তাকিয়ে একেবারে খাবার ঘরের পার্টিশনের ধারে মীনা আর রিনাদির কাছে চলে গেল।

গলা নামিয়ে বলল, "ডাবুদাকে পাওয়া গেছে?"

মীনাদি গোগোলের মাথায় হাত রেখে, ফোঁপানো কান্নার স্বরে বলল, "না রে, ডাবুকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।"

এই সময়েই বাইরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন ইউসুফ সাহেব, চারতলার শ্রীসীতারাম হনুমন্তিয়া, আর ছতলার খুব মোটাসোটা ফরসা নন্দলালবাবু। তাঁদের দেখে ডাবুদার বাবা সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। করুণ আর মিনমিনে স্বরে ডাকলেন, "আসুন।"

নন্দলালবাবুই আগে ঢুকতে-ঢুকতে বললেন, "আপনি ব্যস্ত হবেন না নীহারবাবু, বসুন। খবরটা জানতে এলাম, ডাবুর কোনো খোঁজ-টোজ পাওয়া গেল?"

ডাবুর বাবা হতাশভাবে মাথা নাড়লেন। মাসীমা তাড়াতাড়ি সেখান থেকে উঠে মীনাদি-রিনাদির কাছে চলে এলেন। আর তারা দুজনে, মাসীমাকে ধরে নিয়ে খাবারের ঘরে চলে গেল। গোগোল ভেতরে যাবে ভেবেও যেতে পারল না। সেখান থেকেই উঁকি দিয়ে দেখল, মাসীমা খাবার টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লেন, তারপরেই মুখটা গুঁজে দিলেন টেবিলে, আর হু হু করে কেঁদে উঠলেন। রিনাদি মাসীমাকে জড়িয়ে ধরে কান্না চাপতে চেষ্টা করে বলল, "মা, তুমি এমন করে কাদলে আমরা কী করব?"

সেই সময়ে ভেতরের ঘর থেকে ডাবুদাদের রান্নার লোকটি বেরিয়ে এল। মাসীমা কান্না-ভরা স্বরে বললেন, "কী করব বল্। আমি যে কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারছি না। ডাবু আমাদের ছেড়ে কোথায় চলে গেল?"

মীনাদি ঝুঁকে পড়ে মাসীমাকে কিছু বলতে গেল আর ঠিক সে সময়েই বসবার ঘরে ডাবুদার বাবার গলা শোনা গেল, "না না, সেরকম কিছুই হয়নি। আমি তো কিছু বলিইনি, ডাবুর মাও ডাবুকে গত দু তিনদিনের মধ্যে কোনোরকম বকাঝকা করেননি।"

গোগোল বাইরের ঘরের দিকে মুখ ফেরাল। দেখল, নন্দলালবাবু, ইউসুফ সাহেব, সীতারাম হনুমন্তিয়া ,সকলেই সোফায় বসেছেন। ইউসুফ সাহেব ভাল বাঙলা বলতে পারেন। তিনি বললেন, "সেটা তো কোনো কাজের কথা না। ছেলে-পিলেরা দুষ্টুমি করলে বাবা-মা বকেই থাকেন। তা বলে কি ছেলেরা না-বলে কয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়?"

ডাবুদার বাবা পুলিস-অফিসারদের দেখিয়ে বললেন, "ওঁরাও প্রথমে এইরকমই সন্দেহ করেছিলেন।"

সকলেই অফিসার দুজনের দিকে তাকালেন। টাকমাথা বয়স্ক অফিসার একটু হেসে বললেন, "আমরা কি আর এমনি-এমনি সন্দেহ করি? লালবাজারে আমাদের কাছে এরকম ছেলে হারিয়ে যাওয়ার খবর রোজ উনত্রিশ গণ্ডা করে আসে। আর খোঁজ-খবর করে দেখি, তার মধ্যে আটাশ গণ্ডাই হল বাড়িতে মা-বাবার কাছে বকুনি খেয়ে রাগ করে কোথাও লুকিয়ে রয়েছে। নয়তো কোনো অন্যায় করে পালিয়ে গেছে। সেইজন্যই আমাদের মাথায় আগে ওই কথাটাই আসে।"

ডাবুদার বাবা বললেন, "ডাবুকে আমরা অনেক সময়েই বকি-ঝকি, কিন্তু কখনো ও এরকম করে না। আর সেইজন্যই আমার মন খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

নন্দলালবাবু বললেন, "মন খারাপ হবারই কথা। তবে একটু ধৈর্য ধরুন নীহারবাবু। ছেলেপিলেদের মর্জি যে আজকাল কী হয়েছে, কিছুই বোঝা যায় না। হয়তো কোনো বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে রাত্রি হয়ে গেছল, সেই ভয়ে আর বাড়িই ফিরতে পারছে না। আমার বড় ছেলে ননীগোপাল একবার কী কাণ্ড করেছিল, সে তো আপনারা জানেন না।"

ডাবুদার বাবা ছাড়া সকলেই নন্দলালবাবুর দিকে তাকালেন। নন্দলালবাবুকে দেখলেই মনে হয়, তিনি যেন সব সময়ে কেবল গল্প বলতেই আছেন। সবাই এখন ডাবুদার কথা ভাবছেন, আর উনি ননীগোপালের গল্প ফেঁদে বসছেন। ননীগোপালদার কবে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। আর তাঁর তিনটি ছেলেমেয়ে। তবু নন্দলাল-বাবু বললেন, "তখন আমরা শ্যামবাজারের দিকে থাকতাম। ননীগোপাল ক্লাস টেনে পড়ে। শ্রীমান করেছে কী, বাড়িতে কাউকে কিছু না বলে, কতগুলো বখাটে ছেলের সঙ্গে রাত্রের শো-তে সিনেমা দেখতে চলে গেছে। সিনেমা দেখে বেরিয়ে দেখেছে, রাত্রি বারোটা বাজে। সেই ভয়ে আর বাড়িতেই ফিরে এল না। বন্ধুদের সঙ্গে তাদের বাড়ি চলে গেল। আমাদের কী অবস্থা ভাবুন! সারারাত্রি ঘুমোতে পারিনি। থানায় খবর দিয়েছি। অবিশ্যি তার পরদিন ননী নিজেই চোরের মতো লুকিয়ে বাড়ি ঢুকেছিল।" বলে তিনি এমনভাবে হা হা করে হেসে উঠলেন, গোগোল পর্যন্ত অবাক আর বিরক্ত না-হয়ে পারল না।

দ্বিতীয় পুলিস অফিসার—যাঁর বয়স অনেক কম আর চেহারাটা বেশ সুন্দর, তিনি যেন একটু বিরক্ত হয়েই ভুরু কোঁচকালেন। বললেন, "কিন্তু নবনীতর ব্যাপারটা মোটেই সেরকম নয়। আমরা সে সব খোঁজখবর করে দেখেছি। নবনীত গতকাল ইস্কুলেই যায়নি।"

নবনীত ডাবুদার ভাল নাম। কিন্তু অফিসারের কথা শুনে, গোগোলের মনটা চমকে উঠল। ডাবুদা গতকাল ইস্কুলেই যায়নি? তবে কোথায় গিয়েছে?

টাক-মাথা অফিসার বললেন, "আমরা ইস্কুলে খোঁজ নিয়েছি। নবনীত গতকাল ইস্কুলে অ্যাবসেণ্ট ছিল। যা ঘটবার, তা ইস্কুলে যাবার পথেই ঘটেছে।"

এ কথা শুনে গোগোলের বুকটা ধক্ করে উঠল। আশ্চর্য! কয়েক মাস আগে যে-গুজরাটি ছেলেটি হারিয়ে গিয়েছিল আর পরে যাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল, সেও ইস্কুলে যাবার সময়েই হারিয়ে গিয়েছিল। আরও আশ্চর্য, সেই ছেলেটাও ডাবুদার সমবয়সী ছিল। সেই ছেলেটা লেখাপড়ায় ভাল ছিল, ডাবুদা তা নয়। ডাবুদারও কি তা হলে সেরকম কিছু ঘটেছে?

গোগোলের শিরদাড়াটা কেঁপে উঠল। গায়ের মধ্যে শিউরে উঠল। ডাবুদার বাবা ভয়-পাওয়া করুণ গলায় বলে উঠলেন, "আমি কিছু ভেবেই পাচ্ছি না, ডাবু কোথায় যেতে পারে। আমার ছেলে দুষ্টু, সে-কথা আমি মানি, কিন্তু শুধু-শুধু এরকম দুষ্টুমি সে কখনোই করবে না।"

সীতারাম হনুমন্তিয়া এই প্রথম বাঙলায় বললেন, "এর থেকে যে-কথাটা মনে আসে, তা হল, ডাবু কোনো বাজে লোকের পাল্লায় পড়েছে কি না?"

গোগোল কান খাড়া করে সীতারামবাবুর কথা শুনল। সবাই তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন। সীতারামবাবু একটু কেসে নিয়ে বললেন, "বাজে লোক বলতে আমি বোঝাতে চাইছি, ডাবু হয়তো লোকটাকে চেনে, কিন্তু তার আসল চরিত্রটা জানে না। সেই লোকটা হয়তো ভুলিয়ে-ভালিয়ে ডাবুকে কোনোরকমে তার আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছে, এর পরেই নীহারবাবুর কাছে টাকা চেয়ে পাঠাবে, ভয় দেখাবে, নইলে ডাবুকে সে খুন করে ফেলবে।"

গোগোলের শিরদাঁড়া বারে-বারে শিউরে উঠতে লাগল। এরকম ঘটনাও খবরের কাগজে বেরোয়। ম্যাগাজিনের গল্পেও এরকম ভয়ংকর আর অদ্ভুত সব ঘটনার কথা লেখা হয়। ডাবুদার জীবনে যে এরকম ঘটনা ঘটতে পারে, ভাবাই যায় না। কিন্তু ডাবুদার মতো বয়সের ছেলেকে কি কেউ ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে যেতে পারে? ডাবুদার চাল-চলন দেখলে তো মনে হয়, সে নিজেই যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে। অল্প বয়স আর দেখতে সুন্দর অফিসারটি বললেন, "হনুমন্তিয়াজী, এসব কথা আমরা গোড়াতেই ভেবেছি। আর তার জন্য আমাদের গোয়েন্দাবিভাগ এর মধ্যেই কাজে লেগে গেছে। আশেপাশে যতরকম সন্দেহ-জনক লোকজন আছে, তাদের সকলের চলাফেরার ওপরেই তারা নজর রাখছে। আমরা সমস্ত মিসিং স্কোয়াডগুলিকে নবনীতর বয়স চেহারা জানিয়ে খবর দিয়েছি। হাওড়া শিয়ালদা দুটো স্টেশনেই কাল রাত্রে খবর চলে গেছে। আজকের রাত্রের মধ্যে সারা ওয়েস্টবেঙ্গল, আর ভারতবর্ষের বড় বড় শহরগুলোতে খবর চলে যাবে।"

টাক-মাথা অফিসার বললেন, "আমরা আমাদের কাজ করে যাচ্ছি। নবনীতর সম্পর্কে আমরা ইস্কুলে আর পাড়ায় সবরকমের খবরই নিয়েছি। তার পড়াশোনার রিপোর্ট ভাল নয়। পাড়াতেও শুনলাম, সে তার থেকে বয়সে বড় কয়েকটি আজে-বাজে ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করে। তার মধ্যে দুটি ছেলেকে আমরা থানায় নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করেছি, কোনো ফল পাওয়া যায়নি। তারা স্বীকার করেছে, নবনীতর টাকায় তারা রেস্টুরেন্টে খায়, সিনেমা দ্যাখে। কিন্তু নবনীত কোথায় গেছে তারা কিছুই বলতে পারে না।"

গোগোল যতই শুনছিল, ততই যেন তার হাত-পা অসাড় হয়ে আসছিল। ডাবুদার হারানো নিয়ে এত সব ঘটনা ঘটে গিয়েছে? ওর কাছে সব ব্যাপারটাই অদ্ভুত ভয়ের গল্পের মতো লাগছে। এই সময়েই গোগোল চমকিয়ে উঠে দেখল, ওর বাবা বাইরের ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ডাবুদার বাবা ডাকলেন, "আসুন সমীরেশবাবু।"

গোগোলের বাবা ঘরে ঢুকতেই তাঁর সঙ্গে গোগোলের চোখাচোখি হল। বাবা অবাক হলেন, আর গোগোল যেন অপরাধ করে ধরা পড়ার মতো সংকোচে ভয়ে বাবার দিকে তাকাল। বাবা অবাক হয়ে ভুরু কোঁচকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখানে কী করছ? নীচে খেলতে যাওনি?"

গোগোল কোনোরকমে "যাচ্ছি" বলেই বাবার পাশ কাটিয়ে একেবারে ঘরের বাইরে। বাইরে গিয়েই সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে লাগল। খবরগুলো এখনই নীচে গিয়ে বন্ধুদের দিতে হবে। ও ছতলায় নেমে ডান দিকে ঘুরে নীচের সিঁড়িতে পা দিতে যাবে আর তখনই বাঁ দিকের ফ্ল্যাটের বন্ধ দরজার ভেতরে কে যেন বলে উঠল, "এই চুপ!" তারপরেই হঠাৎ ধুপ করে একটা শব্দ, তার সঙ্গে খস করে কিছু টেনে নেওয়ার।

গোগোল দাঁড়িয়ে পড়ল। ফ্ল্যাটের ইয়েল লক লাগানো বন্ধ দরজার দিকে তাকাল। দরজার ওপরেই নেম প্লেটে লেখা রয়েছে, "এইচ পি মহেশানি"। গোগোল জানে, মহেশানিরা হলেন সিন্ধি। হয়তো ঘরের মধ্যে কেউ কিছু চুপিচুপি বলছেন। ডাবুদার ঘটনা শুনে ওর মাথাটাই বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাই পরের ঘরের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। যা খুবই অন্যায়। কোনো লোকের ঘরের কথা শোনা উচিত না। ও আবার তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

[ক্রমশ]

ছবি/সমীর সরকার

কাঠবিড়ালীর বাচ্চা

একবার হুগলীতে আমার মামাবাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি তীর্থ মামার ঘরের ঘুলঘুলিতে একটা কাঠবিড়ালীর দুটো বাচ্চা হয়েছে। আমি সে দুটোকে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে পুষবো ঠিক করলাম। মামাবাড়িতে দুদিন থাকার পরে ঠিক হল নৈহাটীতে পিসীর বাড়ি যাওয়া হবে। তখন সমস্যা হল কী করে কাঠবিড়ালীদের নিয়ে যাওয়া হবে। তীর্থ মামা তখন ঘুলঘুলি থেকে কাঠবিড়ালীর বাসা পেড়ে সেটা একটা পিজবোর্ডের বাক্সে ঢুকিয়ে দিলেন আর বাক্সের ভেতরে লিখে দিলেন কাঠবিড়ালীদের কখন কখন খাওয়াতে হবে। তারপর বাক্সের উপর ছোট্ট দুটো ফুটো করে বাক্সের মধ্যে বাচ্চা দুটোকে ঢুকিয়ে বাক্সটা বন্ধ করে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিলেন। এইভাবে কাঠবিড়ালীদের প্রবাস-যাত্রা শুরু হল।

আমরা এরপর পিসীর বাড়ি রওনা হলাম। পিসীর বাড়ি এসে আমি বাক্সটা পিসীর হাতে দিয়ে বললাম, "এই নাও, তোমার জন্য দিদু মিষ্টি পাঠিয়েছেন।"

পিসী বাক্সটা খুলতেই একটা কাঠবিড়ালী পিসীর হাতের উপর লাফিয়ে পড়ল আর একটা পিসীর কাঁধে উঠে গেল। পিসী ভয়ে লাফিয়ে উঠলেন, পিসতুতো বোনেরা ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল, মুহূর্তের মধ্যে একটা মজার কান্ড ঘটে গেল।

তখন আমি আর বাবা হাসতে হাসতে কাঠবিড়ালী দুটোকে বাক্সে ঢুকিয়ে বাক্স বন্ধ করে দিলাম। তাও ওদের ভয় একটুও কমল না, আমরা যতক্ষণ পিসীর বাড়িতে ছিলাম ততক্ষণ আমার পিসী ও বোনেরা ঐ বাক্সটার কাছ থেকে দূরে দূরেই ছিল।

ছবি ও লেখা : হৈমন্তী গোস্বামী (বয়স—১০)

চড়ুইপাখির বাসা

আমি একদিন ছোট ঘরে বসে বসে পড়ছি। হঠাৎ দেখি, ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির বাসা। আমি তখন মাকে গিয়ে বললাম, "মা, আমাদের ছোট ঘরে চড়ুই পাখি বাসা করেছে।" তখন মা রেগে গিয়ে বললেন, "আবার বাঁদর মেয়ে উঠে এসেছিস? পড়গে যা।" তখন আমি ফিরে গিয়ে পড়তে বসলাম। কিন্তু, পড়ায় মন বসছিল না। আমি বারবার ওই ঘুলঘুলিটার দিকে তাকাচ্ছিলাম। একটু পরে মা বললেন, "স্কুল যাবার সময় হয়ে গেছে।" তখন আমি উঠে পড়লাম, চান করে ভাত খেয়ে স্কুলে গেলাম। আমার বন্ধু সঞ্চিতা, তপশ্রী, চম্পাকে বললাম, আমাদের ছোট ঘরে চড়ুই পাখি বাসা করেছে। শুনে সঞ্চিতা বলল, "তোদের ছোট ঘরে চড়ুই পাখি বাসা করেছে? আমার চড়ুই পাখি ভীষণ ভাল লাগে।"

ছুটি হয়ে গেলে বাড়ি ফিরে এলাম। বাড়িতে এসে দেখি ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখি নেই। তখন আমার মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। তারপর ভাবলাম, হয়ত চড়ুই পাখি খাবারের খোঁজে গেছে। চেয়ার নিয়ে গিয়ে দেখি, চড়ুই পাখির ডিম থেকে দুটো ছানা ফুটেছে। তখন আমার খুব আনন্দ হল। তারপর আমি মাকে গিয়ে বললাম, "মা চড়ুই পাখির ডিম থেকে দুটো ছানা ফুটেছে।" মা বললেন, "ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখি। ও মা! কালকেই ফেলে দিতে হবে, না হলে ও আমার সব চাল খেয়ে সর্বনাশ করবে।" তাই শুনে আমি বিছানায় শুয়ে শুয়ে কাঁদতে লাগলাম। পরদিন সকালে উঠে দেখি, ঘুলঘুলিতে চড়ুই পাখির ছানা নেই। তখন আমার মন আবার খারাপ হয়ে গেল। আমি রাগ করে সাত দিন মা, বাবা কারও সঙ্গে কথা বললাম না।

বর্ণালী চট্টোপাধ্যায় (বয়স—১০)

আমার পুতুল

আমার একটি পুতুল আছে। তার নাম টুকটুকি। আমি ও আমার বোন টুপুর তাকে নিয়ে রোজ খেলা করি। তাকে বউ সাজাই। সে রোজ রাত্রিবেলা আমার কাছে ঘুমোয়। সকালে না ডাকলে ওঠে না।

সুদীপ্তা মুখোপাধ্যায় (বয়স ৮)

টি ভি যেই খুললাম
খৈরীকে দেখলাম

ছবি ও লেখা :
মনীষা দাশগুপ্তা (বয়স—৫)

আদুরে বাঁদর

এক যে ছিল বাঁদর
গায়ে দিয়ে চাদর
মায়ের কাছে শুয়ে
খেত কেবল আদর।

আবীর ভট্টাচার্য (বয়স—৮)

গিন্নি

আমাকে আমার বাবা তিন্নি বলে
ডাকেন। মা বলেন পাকা গিন্নি।
আমার শাড়ি নেই, চাবিও নেই।
বড় হলে বাবা আমায় শাড়ি আর
চাবি কিনে দেবেন। তখন আমি
ঠিক গিন্নি হয়ে যাব।

সংযুক্তা মিত্র (বয়স—৬)

দুষ্টুর ফিস্টি

এক যে ছিল দুষ্টু ছেলে
দেখতে কিন্তু মিষ্টি
একদিন সে করতে গেল
দাদার সঙ্গে ফিস্টি
ফিস্টিতে সে খেল
গোটা দশেক মিষ্টি

পূর্বা বাগচী (বয়স ১০)

নাচতে গিয়ে পাড়া

ছোট্ট আমার মেয়ে
নতুন জামা পেয়ে,
নাচতে গিয়ে পাড়া
কাদা মেখেই সারা।

পর্ণা মুখোপাধ্যায় (বয়স—৭)

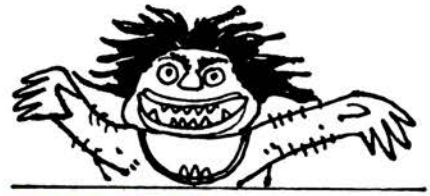

অদ্ভুত ভূত

এক ছিল ভূত
বড় অদ্ভুত
পেট জ্বলে দাউ দাউ
করে তাই হাউ মাউ

মটকিয়ে ঘাড় খায়
সামনেতে যাকে পায়!

পার্থপ্রতিম দাস (বয়স—১১)

সমুদ্রের দৈত্য

সন্দীপ সরকার

বাচ্চা হবার সময়ে ঝাঁকে-ঝাঁকে তিমি সমুদ্রতটের কাছে এসেছে। সেই সময়ে বিমান থেকে তোলা ছবি।

তিমিকে সমুদ্রের দৈত্য ছাড়া কী বা বলা চলে? খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীস দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক অ্যারিস্টটল বুঝতে পেরেছিলেন, তিমি মাছ নয়, জলচর জন্তু। স্তন্যপায়ী। পৃথিবীতে এত বড় জন্তু আর দেখা দেয়নি। নীল তিমি হল সবচেয়ে বড় জাতের তিমি। প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ডাইনোসর পর্যন্ত নীল তিমির চাইতে আকারে ছোট। নীল তিমি লম্বায় নব্বই থেকে একশ' ফুট পর্যন্ত হয়, দেহের ওজন দুশো টন বা তেত্রিশটা আফ্রিকান হাতির সমান। সবচেয়ে ছোট্টখাট্টো জাতের তিমিও দৈর্ঘ্যে ন-ফুট। জন্মের সময় তিমির বাচ্চার দেহের ওজন দেড় থেকে চার টন পর্যন্ত হয়। বছর দুয়েকের মধ্যে তার ওজন বাড়ে ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার পাউন্ড।

তিমিকে মানুষ দেখেছে বিস্ময়ের চোখে। কখনো ভয় আর ভক্তিতে সে চোখ বুজে ফেলেছে। তিমি সম্বন্ধে কিংবদন্তী আর উপকথা চালু আছে নানান দেশে। মানুষের আঁকা ছবিতে আর লেখায় তার ছাপ পর্যন্ত পড়েছে। ক্রীট দ্বীপের প্রাচীন সভ্যতার উদাহরণ হল, মিনোয়ান রাজ্যের রাজধানী নোসস। এই নোসসের এক মন্দিরে চার হাজার বছর আগে কোনো এক শিল্পী দেওয়ালচিত্রে এঁকেছেন তিমি। গ্রীস আর রোমের মন্দিরের গায়েও সে নিজের জায়গা করে নিয়েছিল। গল্পে আছে সিন্ধুবাদ নাবিক সমুদ্রে ভাসমান তিমির পিঠকে দ্বীপ বলে ভুল করে সেখানে রান্নার আয়োজন করেছিল। শেষে আগুন জ্বালতেই তিমি হুশ করে ডুব দেয়। গত শতাব্দীতে তিমি শিকারের শ্রেষ্ঠ রূপক কাহিনী 'মবি ডিক' লেখেন হারমেন মেলভিল।

তিমি বহু আগে স্থলচর ছিল। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ পেয়েছেন, ছ-লক্ষ বছর আগে এক দল লোমশ চারপেয়ে স্তন্যপায়ী, খাবার বা আশ্রয়ের খোঁজে, জলে নেমেছিল। বহুকাল জলে থাকতে থাকতে পেছনের পা দুটোর বদলে দেখা দিল লেজ। দেখতে মাছের লেজের মতো অনেকটা। তফাত হল তিমির লেজ খাড়া নয় শোয়ানো, তাই ডাইনে-বাঁয়ে নাড়া যায় না। কিন্তু ওপরে-নীচে নাড়ে। তেমনি সামনের হাতের বদলে গজাল পাখনা। জলে থাকার ফলে এক সময় লোমের বদলে মোটা পুরো চর্বির আস্তরণ গজাল। একেই বলে 'ব্লবার', গলালে খুব ভাল তেল হয়। মাছের সঙ্গে তিমির কয়েকটা পার্থক্যের মধ্যে একটা হল মাছের মতো সে ডিম পাড়ে না। মানুষের মতো তারও বাচ্চা হয় একটা একটা করে। মা তিমি বাচ্চাকে বুকের দুধ খাওয়ায় দিনে চল্লিশ বার অর্থাৎ পাঁচশ পঞ্চাশ লিটার বা হরিণঘাটার এক হাজার একশ বোতল দুধ। তবে সে দুধ নাকি যেমন খাঁটি তেমনি পুষ্টিকর। তাতে আমিষের ভাগটাই বেশি। হাজার হোক তিমির দুধ বলে কথা!

মাছের সঙ্গে আরেকটা বড় রকমের তফাত হল, তিমি ফুসফুস দিয়ে নিশ্বাস নেয়। জলে থাকার দরুন নাকের ফুটো মাথার ওপরে সরে গেছে। জলের নীচে ডুব দিয়ে বহুক্ষণ থাকে। যখন দম নেবার জন্যে জলের ওপর মাথা তোলে, তখন তার মাথার ওপর কুড়ি ফুট পর্যন্ত উঁচু ফোয়ারার মতো দেখা যায়। ফোয়ারা দেখেই জাহাজীরা বোঝে, তিমি। বৈজ্ঞানিকদের মতে এটার মধ্যে জলের ভাগ খুব সামান্য। ফুসফুস থেকে নিশ্বাসের

জমাট হাওয়া বাইরে এলে এই হয় অবস্থা। শীতের ভোরে কথা বলতে গেলে আমাদের মুখ থেকে যেমন ধোঁয়া বেরোয়, এও তাই।

মানুষের চেয়ে তিমির মগজের ওজন বেশি। স্পার্ম জাতের তিমির মাথার ঘিলুর ওজন কুড়ি পাউন্ড। এত "ধূসর পদার্থ" আর কোনো প্রাণীরই মাথায় নেই। মানুষেরও না। মানুষের মতোই তিমির আয়ু আশি বছর। কোনো কোনো তিমি স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার করে। দল বাঁধে। চাঁদনী রাতে সমুদ্রে খেলা করে। একজন বিপদে পড়লে অন্যরা ছুটে আসে। মানুষের মতো ছেলে-মেয়েদের ভালবাসে। আহত বাচ্চাকে পিঠে করে মা-বাবা পালা করে নিয়ে যায়। মানুষের মতো ভ্রমণ করতে তারা ভালবাসে। গ্রীষ্মকালে মেরু অঞ্চলে যখন বরফ গলে তখন তারা সেখানে খাবার খুঁজতে হাজির হয়। এইখানেই তাদের বাচ্চা হয়। শীত পড়লে উষ্ণতর অঞ্চলে ফেরে। আবার মানুষেরই মতো তাদের নিউমোনিয়া, টি বি, ক্রিমি হয়। এমন কী, তিমিদের দলে দলে আত্মহত্যা করতেও দেখা গেছে। তারা নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলে। ডাঙার জীব হয়েও তারা জলের পরিবেশে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মুখ থেকে গুরুগম্ভীর আওয়াজ ভীষণ জোরে ছুঁড়ে দিয়ে, জলের মধ্যে ধ্বনি প্রতিধ্বনি শুনেই, তারা ধরতে পারে চারপাশের জায়গাটা কেমন।

তিমি শিকার কিন্তু খুব পুরনো ব্যাপার। নরওয়েতে তিমির কংকালের সঙ্গে চার হাজার বছরের পুরনো পাথরের "হারপুন" পাওয়া গেছে। "হারপুন" এক রকম বর্শা, যা ছুঁড়ে তিমি শিকার করা হয়। হারপুনের পেছনে দড়ি বাঁধা থাকে। নৌকার মধ্যে লাগানো বিরাট চরকির মতো "হুইল" থেকে দড়ি খুলতে থাকে। অনেক সময় আহত তিমির ঝটাপটিতে দড়ি ছিঁড়ে নৌকা উল্টে যেত। ১৮৬০ সালে স্বেন্ড ফোয়েন বন্দুক থেকে ছোঁড়া যায় এমন হারপুন বানালেন। এর আগায় আবার বোমা লাগানো। এমন বন্দুক হারপুন হাতে নিয়ে কলের নৌকা বা জাহাজে চেপে তাড়া করলে তিমি পারবে কেন? তাছাড়া গত শতাব্দী থেকে গ্রীষ্মকালে শিকারীরা মেরু অঞ্চলে যেতে শুরু করল। খাবার যোগাড়ে আর বাচ্চা হবার জন্যে হাজার হাজার তিমি প্রতি বছর এইখানে এসে শিকারীদের হাতে প্রাণ দেয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনের বাস্ক উপজাতির লোকেরা যেভাবে তিমি শিকার করত তার মধ্যে দুঃসাহস ছিল। এখনও পুরনো কায়দায় তিমি শিকার করে এসকিমোরা। উত্তর মেরু অঞ্চলের সমুদ্রের ধারে তারা তাঁবু পেতে গ্রীষ্মকালে বসে যায়। তিমি দেখলেই তারা চটপট সীলের চামড়ার নৌকায় চেপে তাড়া করে। চৌখস শিকারী হলেও তারা কিন্তু আদিম মানুষ; বিশ্বাস করে, তিমি নিজে না ধরা দিলে কেউ তাকে ধরতে পারে না।

তিমির মাংস জাপানীরা ভালবাসে। সেখানে দুপুরে খাবার সঙ্গে স্কুলের ছেলে-মেয়েদের তিমির মাংস দেওয়া হয়। তিমি মাছ শিকার করার জাহাজ আর নৌকা, কাটাকুটি করার কারখানা, এককালে আমেরিকারই ছিল বেশি। এখন জাপানের। ষাট টন ওজনের তিমির মাংস আলাদা করে, চর্বি গলিয়ে, হাড় পিষে তেল বানিয়ে ফেলা যায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। স্পার্ম জাতের তিমি শিকার করে অস্ট্রেলিয়া। স্পার্মের মাথার ঘিলু থেকে যে তেল বেরোয় তা কারখানার যন্ত্রপাতি চালু রাখার পক্ষে সবচেয়ে ভাল। সৌভাগ্যের বিষয় এখন জোজোবা বীন থেকে চমৎকার তেল তৈরী হচ্ছে। এর জন্যেই হয়তো স্পার্ম তিমি বেঁচে যাবে।

ভারী সুন্দর এই অতিকায় সামুদ্রিক দৈত্যগুলো। সফেন ঢেউয়ে লুটোপুটি খায়, হুটোপাটি করে। এখন নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। বহু দেশ তাই তিমি সংরক্ষণের জোর চেষ্টা চালাচ্ছে।

এসকিমোরা এখনও পুরনো পদ্ধতিতে তিমি শিকার করে।

আচ্ছা বলো তো

ভানুমতী

প্রঃ সোনার পাথর-বাটিতে করে কী খেতে হয়?
উঃ কাঁঠালের আমসত্ত্ব।

প্রঃ কোন জায়গায় লুচি পাওয়া যায় না?
উঃ বেলুচিস্থান।

প্রঃ কোন মহাদেশকে দড়ি বলে সম্বোধন করা হচ্ছে?
উঃ ইউরোপ।

প্রঃ লম্বা নাতিদের এক কথায় কী বলা যায়?
উঃ নাতিদীর্ঘ।

প্রঃ ধর্মের কল বাতাসে নড়ে কী করে?
উঃ কলটা খুব হালকা বলে।

প্রঃ চাঁদ লুকিয়ে পড়লে মৌর্য বংশের কোন বিখ্যাত রাজাকে পাওয়া যায়?
উঃ চন্দ্রগুপ্ত।

প্রঃ অকুতোভয় মানে কী?
উঃ কুকুরকে যে ভয় করে না।

প্রঃ কোন পাখির মাথায় ঘোমটা টানা?
উঃ বেনেবৌ।

আমাদের প্রকাশিত কিশোর সাহিত্য

মহাশ্বেতা দেবী সম্পাদিত

ভয় দেখানো ভয়ংকর

১ম—৫ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে, প্রতিখণ্ড ৫৲

চিরঞ্জীব সেনের

অলিম্পিকের গল্প ৫·০০ আশ্চর্য্য নিখোঁজ ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
বিশ্বপতির অশ্বমেধ ৫·০০

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
দেবী চৌধুরানী ৩·০০

শক্তিপদ রাজগুরু
বনে গেলেন গবুদা ৫·০০

দক্ষিণারঞ্জন বসু
ঈশ্বরের সেনাপতি ৫·০০

সুজিতকুমার নাগ
মায়াময় রূপকথা ৫·০০

মহাশ্বেতা দেবী ও অসিত গুপ্ত
জাতকের কাহিনী ৩·০০

মহাশ্বেতা দেবী
জাতকের গল্প ৩·০০

করুণা প্রকাশনী : ১৮ এ টেমার লেন, কলকাতা-৯
ফোন : ৩৪-৬২৬৮

বিশ্ব-বিচিত্রা

দিদিমণি

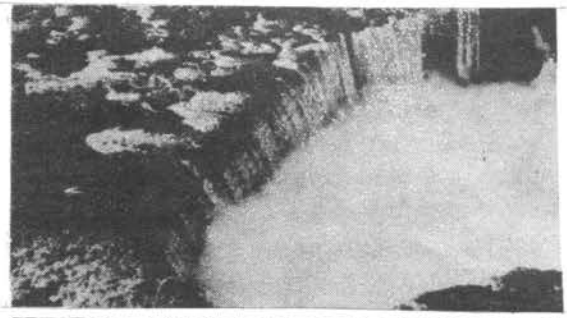

জলপ্রপাত

বড়-বড় জলপ্রপাতের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের প্রচণ্ড শব্দ শুনে এবং তাদের জলের তোড় দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। বেশির ভাগ জলপ্রপাতই নদী থেকে সৃষ্ট হয়েছে। নদীর গতিপথে কখনও-কখনও এমন কঠিন শিলা থাকে, যা নদীর স্রোত সহজে ক্ষয় করতে পারে না। কঠিন শিলার পরে যদি আবার কোমল শিলা থাকে তাহলে নদীর জলের তোড়ে কোমল শিলার ক্ষয় হয়ে যায় কিন্তু কঠিন শিলা ক্ষয় না পেয়ে উঁচুই থেকে যায়। এর ফলে নদীর গতিপথে উচ্চতা আর নিম্নতার সৃষ্টি হয়। কঠিন শিলার ওপর থেকে প্রবলবেগে জল নীচের ক্ষয়প্রাপ্ত শিলার ওপর পড়ে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। নদীর গতিপথে কঠিন শিলা ও কোমল শিলা একটির ওপর একটিও থাকতে পারে, কিংবা পাশাপাশি সাজানোও থাকতে পারে। দুটো ক্ষেত্রেই তাহলে জলপ্রপাতের সৃষ্টি হবে। নদী উচ্চভূমি থেকে হঠাৎ নিম্নভূমিতে পড়লেও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়। জলপ্রপাত সাধারণত নদীর পার্বত্য অঞ্চলেই বেশি দেখা যায়। আরেকটা বৈশিষ্ট্য হল যে, সাধারণত দেখা যায়, জলপ্রপাত ক্রমশই নদীর উৎসের দিকে সরে যেতে থাকে এবং ক্রমে তা নদীর স্রোতের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু কোন-কোন শিলা এত কঠিন যে, কিছুতেই ক্ষয় পেতে চায় না—যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার জাম্বেসি নদীর ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতের নীচের শিলা। ভিকটোরিয়া জলপ্রপাতের তলদেশের শিলা ক্ষয় না পাওয়ার জলপ্রপাতটি এক জায়গাতেই আছে।

জলপ্রপাত হিমবাহিত এলাকায়, মালভূমির প্রান্তদেশে নতুন গঠিত ভূভাগে বা অসমশিলায় গঠিত ভূভাগেই বেশি দেখা যায়। জলপ্রপাত আকারে বড় না হলে ছোট ঝর্নার সৃষ্টি করে। কোথাও কোথাও মালভূমি অঞ্চলে ঘোড়ার খুরের মতো জলপ্রপাতও দেখা যায়, কোথাও বা জলপ্রপাত সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নীচে নেমে যায়। ভারতে অনেক জলপ্রপাত আছে। এর মধ্যে কাবেরী নদীর শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত খুব বিখ্যাত। সরাবতী নদীর যোগ জলপ্রপাতের দৃশ্যও খুব সুন্দর, জব্বলপুরের মার্বেল রকসে নর্মদা নদীর জলপ্রপাতও বিখ্যাত।

উত্তর আমেরিকার নায়েগ্রা জলপ্রপাতের নাম সকলেরই জানা আছে। উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সীমানায় পাঁচটি হ্রদ রয়েছে। এই হ্রদগুলি একটি অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ছোট ছোট নদী দিয়ে। হ্রদগুলি এক সমতলে অবস্থিত নয়—এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি উচ্চতার তফাত দেখা যায় ইরি ও অন্টারিও হ্রদের মধ্যে। এই দুটি হ্রদকে যুক্ত করেছে নায়েগ্রা নদী। ইরি হ্রদ থেকে বেরিয়ে নায়েগ্রা নদী ১৫৮ ফুট নীচে পড়ে একটা বিশাল জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। এই জলপ্রপাতই নায়েগ্রা -জলপ্রপাত নামে বিখ্যাত। এই জলপ্রপাতের উত্তর অংশ কানাডায় এবং দক্ষিণ অংশ যুক্তরাষ্ট্রে। গোট দ্বীপ এই জলপ্রপাতকে দুটি অংশে ভাগ করছে। এই জলপ্রপাতের জলের পতনের শব্দ ভীষণ গর্জনের মতো। অন্যান্য জলপ্রপাতের মতো এই নায়েগ্রা জলপ্রপাতও কানাডার অংশে প্রতি বছর তিন ফুট করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের দিকে প্রতি বছর আট ইঞ্চি করে উৎসের দিকে সরে চলেছে।

ব্যাঙের ছাতা

রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

মনে হচ্ছে ব্যাঙেরা সব কলকাতা শহরের হালচাল দেখে এখান থেকে ইদানীং মানে-মানে সরে পড়েছে। না-হলে এই ঘনঘোর বর্ষাতেও কোলাব্যাঙ তো দূরের কথা, শহরে একটি ব্যাঙাচিও চোখে পড়ছে না কেন? তোমরাই বলো, খিচুড়ি আর ইলিশ মাছের সঙ্গে যদি রাত্তিরবেলা দু-একটা ব্যাঙের ডাক না শোনা গেল তো বিদ্যুৎ-চমকানো বর্ষা-রাতটা বুঝবে কী করে? যারা গ্রামে থাক, তারা অবিশ্যি এ-ব্যাপারে ভাগ্যবান, কেননা বর্ষা-কালে সেখানে এখনো ব্যাঙের আসর খুব জমজমাট। এই সেদিন আমাকেও যেতে হয়েছিল কয়েক দিনের জন্যে কাছের একটি গ্রামে। দেখলাম ব্যাঙেরা বেজায় ফুর্তিতে মাঠে, কাঁচা রাস্তার ধারে, পুকুর-পাড়ে, বাড়ির উঠোনে ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর করে খেলে বেড়াচ্ছে। কিংবা দু-একটা বুড়ো ব্যাঙ ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে গাছের নীচে পাতার আড়ালে চুপচাপ বসে-বসে কী যেন ভাবছে।

আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন কিন্তু বর্ষাকালে ব্যাঙেরা কলকাতায় শহরতলি থেকে বেড়াতে আসত। মাঠে ময়দানে তো তাদের দেখা পাওয়া যেতই, এমন কী বাড়ির উঠোনে, ছাদে তাদের বর্ষার আনন্দে কখনো-কখনো খেলা করতে দেখতাম। মনে আছে আমাদের বাড়ির ছাদে এক সময়ে ছিল অনেক ফুলগাছ। বর্ষা-কালে দু-চারদিন আকাশ কালো করে বৃষ্টি হবার পরেই কোথা থেকে এ-সব গাছের আশেপাশে খুদে খুদে ব্যাঙেরা তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াত।

ফুল গাছের টবগুলো ছিল দু-তিন সারিতে কতকগুলো কাঠের পাটাতনের ওপর। একদিন ছাদে গিয়ে দেখি একটা কাঠের পাটাতনের একপাশে ছোট্ট একটা গোলাপি ছাতার মত কী যেন গজিয়েছে। আমাকে অবাক হতে দেখে মা বললেন, "ওটা হল ব্যাঙের ছাতা। বর্ষায় ভিজে-ভিজে ব্যাঙেদের যাতে জ্বরটর না হয় সেজন্যে ভগবান ওদের তৈরি করে দেন অমনি ছোট্ট ছোট্ট রং-বাহারি ছাতা।"

দু-চার দিনের মধ্যে দেখলাম ওই কাঠের পাটাতনের নানান জায়গায় অনেকগুলি ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে বড় হয়েছে। কোনোটা গোলাপি, কোনোটা হলুদ, কোনোটা আবার রং-বেরঙের। আকারে এগুলো বড়-ছোট হলেও ওদের দেখতে কিন্তু একেবারে ছাতার মত। আমার খুব ইচ্ছে করল ওই ছাতাগুলোকে হাতে করে নিয়ে একটু দেখতে, খেলা করতে। কিন্তু মা বলে দিয়েছিলেন আমি যেন কখনো ব্যাঙের ছাতা নিয়ে খেলা না করি, কেননা কখনো-কখনো ওরা মারাত্মকভাবে বিষাক্ত হতে পারে। পরে বড় হয়ে জেনেছিলাম, ব্যাঙের ছাতাগুলো আসলে এক ধরনের ফাংগাস এবং এদের মধ্যে কোনো-কোনোটা সত্যিই ভীষণ বিষাক্ত। সুতরাং তোমরাও কক্ষনো ব্যাঙের ছাতা নিয়ে খেলা করতে যেও না।

ছেলেবেলায় কিন্তু আমি একথা বিশ্বাস করতাম এবং এখনো যে একেবারে করি না তা নয়, বৃষ্টি নামলে ব্যাঙেদের যখন আর ভিজতে ভাল লাগে না তখন তারা এসে দাঁড়ায় ছাতাগুলোর তলায়—ছোট্ট ছাতাগুলোর তলায় ছোট ছোট ব্যাঙেরা আর বড় ছাতার তলায় মা-ব্যাঙ আর বাবা ব্যাঙ। কিন্তু ছোটবেলায় বৃষ্টি পড়লে মা ছাদে যেতে দিতেন না বলে ওরকম কোনো ঘটনা সত্যিই ঘটছে কি না সেটা জানার উপায় ছিল না আমার। কিন্তু ওই ছাতাগুলোর কথা ভেবে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম যে বৃষ্টি পড়লে ব্যাঙেরা মোটেই অসহায় নয়। ঠাণ্ডায় ভিজে ওদের সর্দি জ্বর হবে না।

একদিন কিন্তু ভারি একটা মজার ঘটনা ঘটল। সবে বৃষ্টি থেমেছে। নরম ভেজা-ভেজা রোদ্দুর ফুল গাছের পাতায় পড়ে চিকচিক করছে। আমি ছাদে গিয়ে দেখি একটা ছোট্ট গোলাপি রঙের ছাতার তলায় একটা ছোট্ট ব্যাঙ বসে তিরতির করে কাঁপছে বাতাসে কাঁপছে আর তার মাথার ওপর ছাতাটা থেকে চুঁইয়ে পড়ছে তখনো জমে থাকা বৃষ্টির জল। দৃশ্যটি আমার এখনো মনে আছে। তখন যদি আমি ছবি তুলতে জানতাম তাহলে আনন্দমেলার পাতায় ছাতার তলায় সেই ব্যাঙটাকে তোমরা আজ দেখতে পেতে।

এরপর অবিশ্যি আমি আর কখনো কোনো ব্যাঙকে ছাতা মাথায় বসে থাকতে দেখিনি। এবং ব্যাঙের ছাতা বিষয়ে, কিছু লেখাপড়া করে জেনেছি যে ওগুলো এক ধরনের ছত্রাক বা ফাংগাস, তার সঙ্গে সত্যি সত্যি ব্যাঙেদের কোনো সম্পর্ক নেই। এখানে তোমাদের একটু জেনে রাখা ভাল ছত্রাক আর উদ্ভিদের মধ্যে মূল তফাতটা কোথায়। ছত্রাকের মধ্যে যে বস্তুটির অভাব তার নাম ক্লোরোফিল। ফলে পৃথিবীর সব সবুজ উদ্ভিদ এবং গাছেদের মত ছত্রাক কিংবা ফাংগাস সূর্যের আলো এবং বাতাসের কার্বন-ডাইঅক্সাইড থেকে তাদের জীবনশক্তি সংগ্রহ করতে পারে না। সুতরাং, কাঠের গায়ে যখন ব্যাঙের ছাতা গজিয়ে ওঠে, তার পুষ্টির জন্যে খাদ্য জোগায় ঐ কাঠের শরীর। তাই যে-জিনিসে ফাংগাস লাগে তা ওই ফাংগাসের খাদ্য জোগাতে-জোগাতে নষ্ট হয়ে যায়।

যাই হোক এ সব কথা জানবার পরেও কিন্তু আমার ভাবতে ভাল লাগে যে, ব্যাঙের ছাতা ব্যাঙেদের জন্যেই তৈরি এবং অন্তত ছাতার ব্যাপারে ব্যাঙেরা মানুষের চেয়ে অনেক বেশি আধুনিক এবং শৌখিন। মেয়েদের ছাতার রঙ অবিশ্যি অনেক রকম হয়, কিন্তু তাদের গঠন এক রকম। কিন্তু গঠনে আর রঙে ব্যাঙের ছাতা কত রকমের হতে পারে তা তোমরা জানো? শুনলে তোমরা আশ্চর্য হবে যে, এ পর্যন্ত পৃথিবীতে হাজার রকমের ব্যাঙের ছাতা আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের বেশির ভাগই দেখতে ভারি সুন্দর। কোনো কোনোটা আবার রাত্তির বেলা আলোর মত জ্বলে। আর পৃথিবী জুড়ে বৈজ্ঞানিকেরা যে এদের নিয়ে কত গবেষণা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সব রকমের ছাতার তাঁরা আলাদা-আলাদা নামও দিয়েছেন, আর কোন্‌টা বিষাক্ত আর কোন্‌টা নয়, সেটাও তাঁরা জেনে ফেলেছেন। কয়েকটা ছাতার নাম তোমরা শুনলেই বুঝতে পারবে যে নামের দিক থেকেও ব্যাঙের ছাতারা বেশ আধুনিক। কোনোটার নাম টনি-গ্রিসেট, কোনোটার শ্যাগি প্যারাসল, আর কোনোটার নাম মোরেল, বার্চ-বলিটাস কিংবা হেজহগ। টনি-গ্রিসেট হল একরকম ফিকে ব্রাউন রঙের ছাতা। আর বার্চ-বলিটাস নামের ছাতার মাথাটা হল ঘন কমলালেবু রঙের। কী যে ভাল দেখতে, বলে বোঝাতে পারব না।

সুকুমার রায়ের 'খাই-খাই' কবিতার সেই লাইনটা তোমাদের মনে আছে তো? ব্যাঙ খায় ফরাশিরা খেতে নয় মন্দ? শুধু ব্যাঙ কেন, ফরাশিরা ব্যাঙের ছাতা খেতেও খুব ভালবাসে এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সেই প্রথম ভোজনোপযুক্ত ব্যাঙের ছাতার (মাশরুমস) চাষ শুরু হয়। এবং এখান থেকেই সমস্ত

পৃথিবীতে ব্যাঙের ছাতার চাষ এবং ব্যবসা ছড়িয়ে পড়ে। জাপানিরা অবিশ্যি গত দু-হাজার বছর ধরে 'শি-টেক' নামের এক ধরনের ব্যাঙের ছাতার চাষ করে আসছে। চীনেদের মধ্যেও বহু-বছর হল ব্যাঙের ছাতার চাষ প্রচলিত আছে। সুইডেনের বাজারেই তো প্রায় তিনশো রকম ভোজনোপযুক্ত ব্যাঙের ছাতা বিক্রি হয়। এছাড়া ফিনল্যান্ড, পোল্যান্ড, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাঙের ছাতা দিয়ে নানা রকম সুস্বাদু খাবার বানাবার রেওয়াজ আছে। এদিক থেকেও বুঝতেই পারছ মানুষের ছাতার চেয়ে ব্যাঙের ছাতা অনেক বেশি কাজের।

ব্যাঙের ছাতা নিয়ে দেশ-বিদেশের রূপকথায় অনেক গল্পও চালু আছে। ছেলেবেলায় কোনো এক গল্পে পড়েছিলাম, একটি ছোট্ট গরিব মেয়ের ছাতা কেনার পয়সা ছিল না। এদিকে দেশে ধর্ষা এসে গেল। মেয়েটি রোজ রোজ পথে-ঘাটে ভেজে আর কাঁদে। তার পাশ দিয়ে প্রজাপতির মত রঙিন সব ছাতা মাথায় দিয়ে ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা যাওয়া আসা করে। মেয়েটার এসব দেখতে দেখতে চোখে জল আসে। তার তো আর ছাতা কেনার পয়সা নেই! একদিন কিন্তু একটা ব্যাঙ মেয়েটার মনের দুঃখটা বুঝতে পেরে তাকে ব্যাঙের দেশের সবচেয়ে সুন্দর আর বড় ছাতাটা এনে দিল। আর মেয়েটি যখন সেই ছাতাটা মাথায় দিয়ে শহরের রাস্তায় বেরুলো, তখন সব্বাই জানতে চাইল কী নাম সেই মেয়েটির যার মাথায় পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর ছাতা? এবারের বর্ষায় আমারও বিচ্ছিরি কালো ছাতাটা হারিয়ে গেছে। ভাবছি কোথায় একটা ব্যাঙের দেখা পাওয়া যায়, যে আমার মনের কথাটা বুঝে ব্যাঙের দেশের সেরা ছাতাটা আমাকে দিয়ে যাবে।

আটখানা

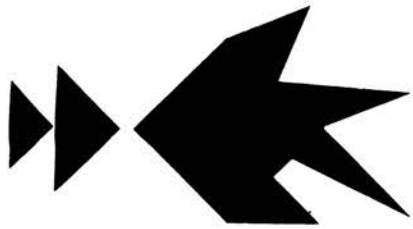

তোমাদের অনেকের বাড়িতেই অ্যাকোরিয়াম আছে, তাতে নানা রঙের মাছের কাণ্ডকারখানা দেখা যায়। মাছগুলো অনবরত ছোটাছুটি করে, কখনও আবার মারামারি করে নিজেদের মধ্যে। আট টুকরো দিয়ে বানানো এই মাছ দুটির বড়টি ছোটটিকে খুব ধমকাচ্ছে মনে মনে। এই মজার মুহূর্তটিকে তোমরাও বানাতে পারো। না পারলে আগামী সংখ্যায় দেখে নিও।

গতবারের উত্তর

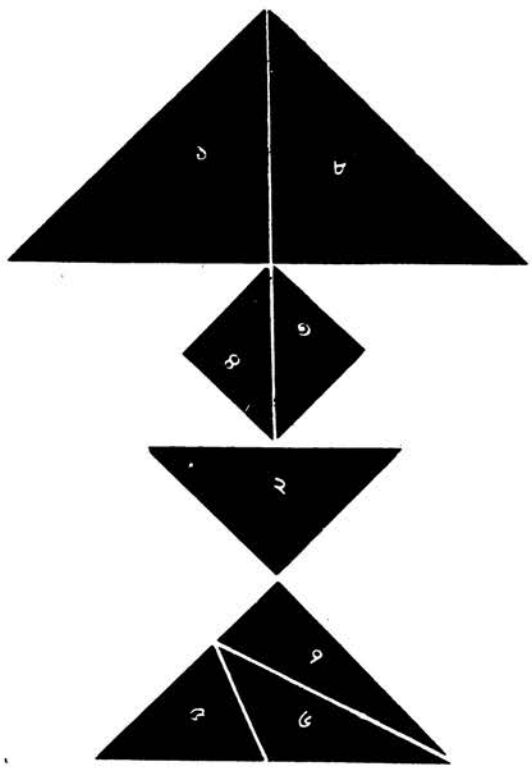

ধাঁধা

রাস্তা যে একটু পিছল ছিল সন্দেহ নেই। খানিক আগে—সাত সকালে—বৃষ্টি হয়ে গেছে এক পশলা। কাল সন্ধেতেও বৃষ্টি নেমেছিল। কাঁচা মাটির রাস্তা। অল্প জলেই কাদা মাখামাখি হয়ে যায়।

তা বলে যে এমন একটা কান্ড হবে কে জানত। ছোট্‌কাই দেখতে পেয়ে ডাকল আমায়। এক ছুটে জানলায় গিয়ে দাঁড়ালাম। বেশ ভিড় জমে গিয়েছে। কেউ বলছে, সাইকেল-চালকের দোষ। কেউ দোষ দিচ্ছে ডিম-বেচা বুড়ীর। লোকটি নাকি "ক্রিং ক্রিং" আওয়াজ তুলে সাবধান করে দিতে চেয়েছিল। বুড়ীই সরে যায়নি সময়মতো। আবার কেউ-কেউ বলছে, দোষ কারোরই তেমন নয়। পিছল রাস্তাই দায়ী।

সাইকেলের আরোহীটি কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। ডিমের ঝুড়ি রাস্তার একধারে কাত-করা, চতুর্দিকে রাশি রাশি ভাঙা ডিম, কিছু ডিম নালায় ভাসছে। হাউমাউ করে কাঁদছে ডিম-বেচা বুড়ী।

ছোট্‌কা জামাটা গলিয়ে নিল গায়ে। আমিও পেছন পেছন চলতে শুরু করি।

আমরা পৌঁছে দেখি একটা আপসের চেষ্টা চলছে। সবাই মিলে চাঁদা করে ভাঙা ডিমের দাম মিটিয়ে দেবে বুড়ীকে। কিন্তু গোল বাধিয়েছে বুড়ী নিজেই। কত ডিম সাকুল্যে ছিল, বলতে পারছে না। বারবার বলছে, তা দু-চার শো হবে। ঠিক কত মনে পড়ছে না।

দুশো আর চারশো কি এক হল? অথচ বুড়ী নাকি ভালভাবে গুনতেই জানে না। অবশেষে, অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করে, ছোট্‌কা একটা অদ্ভুত হিসেব বার করল বুড়ীর মুখ থেকে। বুড়ী নাকি সব কটা ডিম একভাবে গোনার চেষ্টা করেছিল। দুটো, তিনটে চারটে পাঁচটা আর ছটা করে ডিম সাজিয়ে আলাদা ভাবে গুনে দেখেছে সে, প্রত্যেকবারই একটা করে ডিম নাকি বাড়তি হচ্ছিল। সব শেষে সে সাতটা করে ডিম সাজিয়ে গুনেছিল। সেবার কোনো ডিম বাড়তি হয়নি।

একথা শুনে ছোট্‌কা এক মুহূর্তের মধ্যেই চট করে বার করে ফেলল, কটা ডিম ছিল ঝুড়িতে। বুড়ীও খুশি, সকলেই সমান খুশি। ছোট্‌কার বলা সংখ্যাটা বুড়ীর কথার সঙ্গে বেশ মানানসই।

তোমরা বলতে পারো, কটা ডিম ছিল ঝুড়িতে? এটাই **প্রথম ধাঁধা** ॥

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ নীচের সংখ্যাগুলোর মধ্যে কোন্ সংখ্যাটি সম্পূর্ণ বেমানান বলতে পার?

৩, ৭, ২৯, ১১, ১৫, ১৭

তৃতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ সংখ্যার বর্গমূল আর ঘনমূল অভিন্ন?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ মোটা-সোটা এক ভদ্রলোক দুই ছেলেকে নিয়ে এলেন এক নদীর তীরে। নৌকো করে নদী পার হবেন তাঁরা। নিজেরাই চালিয়ে যাবেন। কিন্তু একবারে তিনজনে পার হতে পারবেন না। কেননা, নৌকোটি মাত্রই দু-মন ওজন বহন করতে পারে। ভদ্রলোকের ওজন দু-মন। ছেলেদের প্রত্যেকের ওজন এক মন করে। কী ভাবে পার হবেন তাঁরা?

গতবারের উত্তর ॥ (১) লীলাবতী দুটো বাক্যে বলেছে যে সে নির্দোষ। সুতরাং এর একটিও মিথ্যে হতে পারে না। কেননা, সেক্ষেত্রে অন্য বাক্যটিও মিথ্যে হয়ে পড়ে। সুতরাং তার তৃতীয় বাক্যটি—'এটা তিনকড়ির কাজ'—মিথ্যে।

তিনকড়িও সুতরাং নির্দোষ। তারও প্রথম দুটি বাক্য, সেক্ষেত্রে সত্যি ধরে নিতে হবে। 'মানদাই চোর' মিথ্যে। দুলালের তৃতীয় বাক্যটি মিথ্যে কেননা তিনকড়ি চুরি করেনি। দুলালের প্রথম দুটি বাক্য সত্যি ধরে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে মানদার তৃতীয় বাক্যটি—'দুলাল আমাকে দশ বছর ধরে চেনে'—মিথ্যে। মানদার অন্য দুটি বাক্য তাহলে সত্যি। অর্থাৎ

'যুধিষ্ঠির নির্ঘাত দোষী'—বাক্যটি সত্যি। যুধিষ্ঠিরের বিবৃতির প্রথম বাক্যটি সুতরাং মিথ্যে। সেই চুরি করেছে ব্যাগটি।

(২) ছেলেটির স্কুল পশ্চিমদিকে।

(৩) পরের সংখ্যাটি হবে ৩৫। (প্রথম দ্বিতীয়ের তফাত ১, দ্বিতীয় ও তৃতীয়ের মধ্যে ব্যবধান ২, তৃতীয়-চতুর্থের তফাত ৪, চতুর্থ-পঞ্চমের মধ্যে ব্যবধান ৮, সুতরাং পঞ্চম ও ষষ্ঠের মধ্যে তফাত হবে ১৬-র।)

(৪) ১০ মিনিটই লাগবে।

সত্যসন্ধ ছবি/অহিভূষণ মালিক

কিসের ফটো

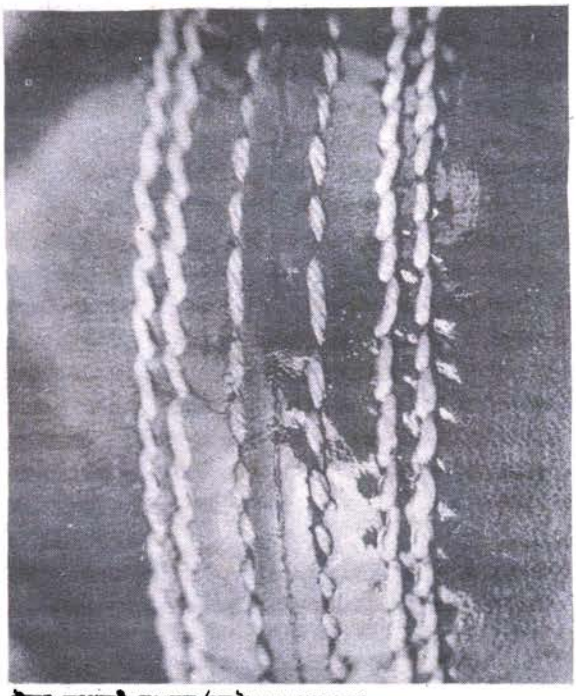

উত্তর আগামী সংখ্যায়/ফটো : তপন দাশ

গতবারে ছিল কাঁচির গোড়ার যে-অংশ আঙুল দিয়ে ধরতে হয়, সেই অংশের ফটো।

কিসের ছবি

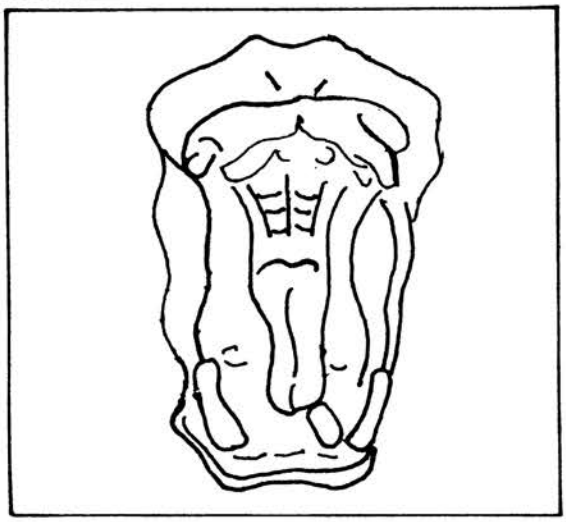

এটা কোনো শিল্পীর আঁকা ছবি নয়, কোনো মূর্তিরও ছবি নয়। এ হল বিশাল চেহারার এক জন্তুর ছবি। ভাবছ, তা কী করে হয়! জন্তুর মাথা কোথায়? হাত, পা, ধড়ই বা কোথায়? আসলে এটা হল জলহস্তীর মস্ত হাঁ। হাঁয়ের পেছনে ওর শরীরটা ঢাকা পড়ে গেছে একেবারে।

চিত্রপাল

শব্দ-সন্ধান

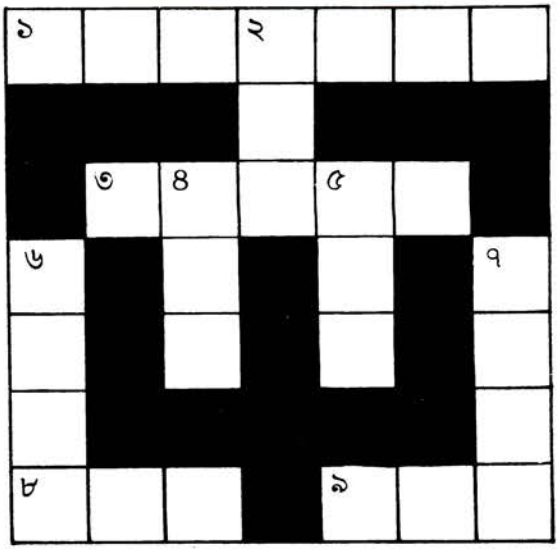

এবার আবার একটা ভৌগোলিক শব্দ-সন্ধান দেওয়া গেল। তবে খুঁজতে বেশিদূরে যেতে হবে না, সবই পশ্চিমবঙ্গে পেয়ে যাবে। সংকেত তো রইলই।

সংকেত : পাশাপাশি : (১) দুটো বিশেষ্য আর একটা ক্রিয়াপদ নিয়ে কোন্ জায়গার নাম? (৩) ফৌজী বিমানক্ষেত্র। (৮) আনন্দমঠ উপন্যাসের একটি চরিত্রের নামে · কোন্ শিল্প-কেন্দ্র? (৯) সুন্দরবন এলাকার একটি শহর।

উপর-নীচ : (২) হিমালয়ের পাদদেশে সমভূমি অঞ্চল। (৪) উলটে নিলে সুন্দরবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী। (৫) ভারতে যে দু' জায়গায় প্রথম ইস্পাত কারখানা তৈরি হয়েছিল তার একটা। (৬) প্রাচীনকালের খুব বিখ্যাত জায়গা—নামও ছিল অন্যরকম। (৭) পূর্ব-হিমালয়ের সবচেয়ে বড় শহর।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গতবারের সমাধান

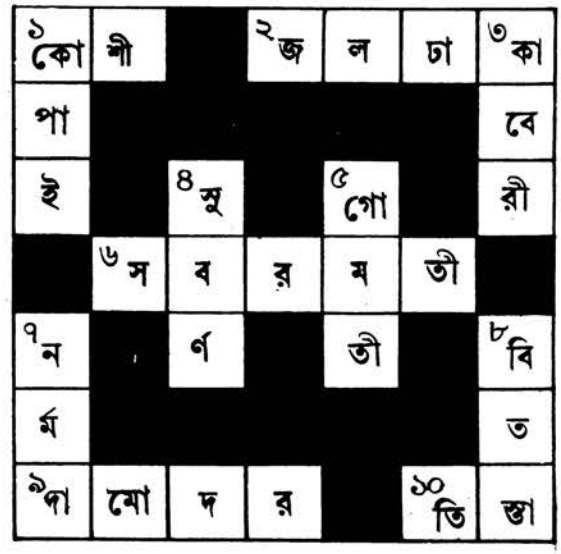

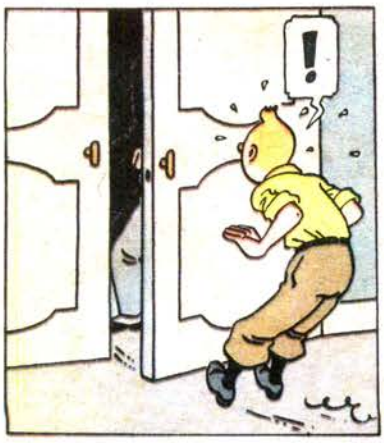
!

ষাচ্চলে! নেস্টরকে জখম করে পালিয়েছে!

কোথায় গেল? কোন্‌দিকে?
কাউকে টেলিফোন করেছিল?
হ্যাঁ।

কাকে টেলিফোন করল?
কী জানি!

এই ফাঁকে সরে পড়তে হবে।

দেখে ফেললেই সর্বনাশ!

ঐ তো টিনটিন! দরজার আড়ালে লুকিয়ে ছিল!

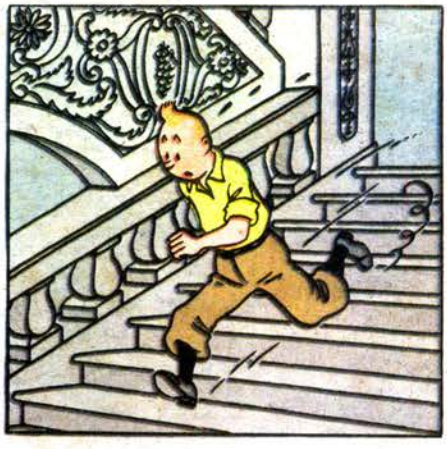

জ্যান্ত হোক্, মড়া হোক, ওকে পাকড়াতেই হবে!

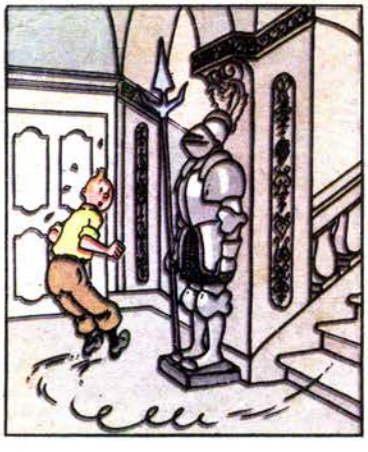

দেখি, এই বল্লমটা কাজে লাগে কিনা।

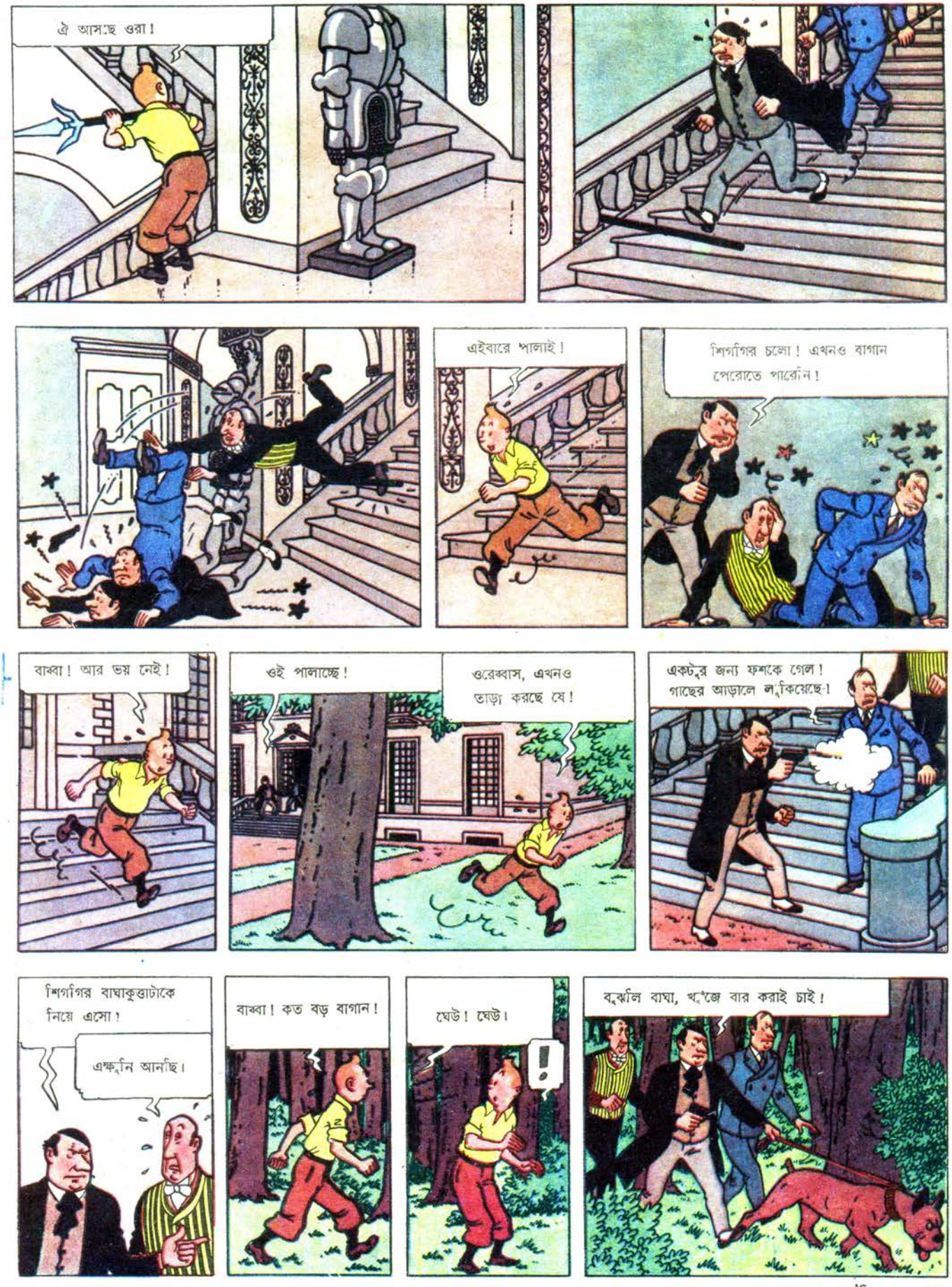

(এরপর চৌত্রিশের পাতায়)

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক কী বলেন

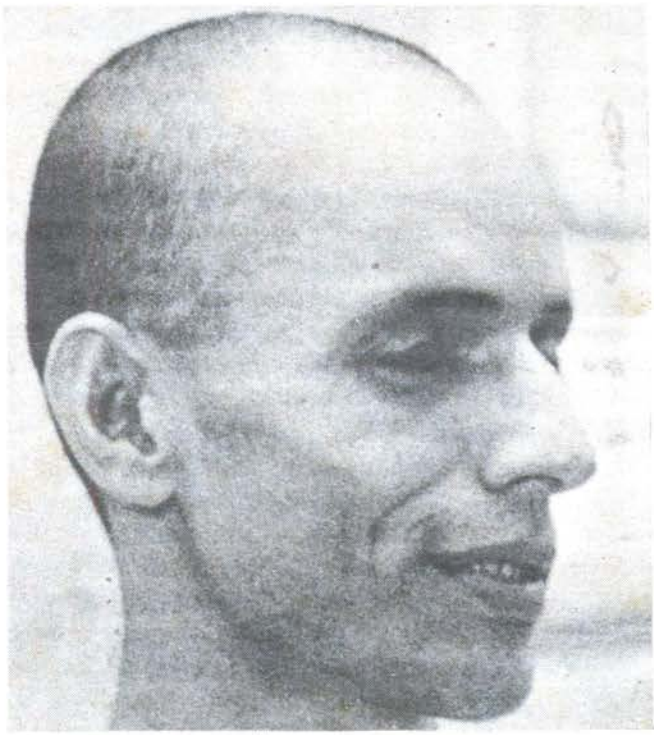

বহুদিন ধরেই ইচ্ছে ছিল, একবার রহড়া যাব। রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম হাই স্কুল দেখতে। প্রথম সেকেণ্ডারি পরীক্ষায় ন' নটা লেটার নিয়ে রেকর্ড করে ফার্স্ট হয়েছিল ঐ স্কুলের জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। শুধু সেই জন্যেই নয়। মফস্বলের উনিশ বছর বয়সের স্কুলটি থেকে হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষাতেও স্ট্যাণ্ড করেছে অনেকবার।

কিন্তু গিয়ে বুঝলাম প্রধান শিক্ষক স্বামী গিরিজানন্দের আনন্দ অন্য কারণে। "খুব ভাল ছেলে দু' একজন থাকতেই পারে। কিন্তু শুধু তাদের নিয়েই তো স্কুল নয়। সামগ্রিক ফলটাও বিচার্য। এই দেখুন না, গতবার ৯৭ জনকে পাঠিয়েছিলাম। প্রতিবারের মত সকলেই পাশ। কেউই থার্ড ডিভিশন নয়। প্রায়ই শতকরা পঞ্চাশজন ফার্স্ট ডিভিশনে যায়। ন্যাশনাল স্কলারশিপও পায় অনেকে।"

শুনলাম আজকাল কলকাতা থেকেও এখানে ছাত্র আসে। অবাক হলাম না। শুধু জানতে চাইলাম, "কীভাবে পড়ান আপনারা?"

স্বামীজী বললেন, "আমাদের ছাত্রদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়।" ব্যাখ্যা করে জানালেন, "হোম টাস্ক, টিউটোরিয়াল ক্লাস, অতিরিক্ত ক্লাস, বিশেষ ক্লাস, আকস্মিক পরীক্ষা সবই আছে এখানে। সিক্স-সেভেন-এইটে চারটে টারমিনাল পরীক্ষা। নাইন-টেনে তিনটে। ক্লাসের সব পরীক্ষার নম্বর ধরে স্ট্যাণ্ড দেওয়া হয়। শিক্ষকরা ছাড়াও ছাত্রদের অতিরিক্ত বইয়ের নাম বলে দেন অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক। শ্রেণীর দেওয়াল পত্রিকায় লিখতে গিয়েও পড়াশোনার আগ্রহ বেড়ে যায়। আর, এখানে পড়াশোনার দিন নষ্ট হয় না বললেই চলে।"

"ছাত্রদের কি উত্তর লিখিয়ে দেওয়া উচিত?"

"কিছু কিছু নিশ্চয়ই। আমরাও দিই। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, সেই উত্তরের ভিত্তিতে ছাত্ররা যেন নিজস্ব উত্তর তৈরি করতে প্রেরণা পায়। এর জন্যে রেফারেন্স বই, তার প্রাপ্তিস্থান সব বলে দিতে হয়। অর্থাৎ শিক্ষক পড়িয়ে কি লিখিয়েই ক্ষান্ত হলে চলবে না। তাঁর দেখানো পথে ছাত্ররা এগোচ্ছে কিনা দেখতে, সংশোধন করতে হবে না? খবরের কাগজে আপনারা যাকে বলেন ফলো-আপ, তাই! তবে, এ কাজটা টিউটোরিয়াল ক্লাসেই সম্ভব।"

"কিন্তু খুব ভাল ছাত্রদের চাহিদা কি তাতেও মিটবে?"

স্মিত হেসে স্বামীজী বললেন, "এখানে তাদের আলাদা ব্যবস্থা আছে। গ্রীষ্মের ছুটির পর থেকেই টেন-এর সম্ভাবনাপূর্ণ পাঁচ ছ' জনকে নিয়ে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে স্পেশাল কোচিং আরম্ভ হয়।"

বুঝলাম, নরেন্দ্রপুরের পনের বছরের অভিজ্ঞতাকে উজাড় করে দিচ্ছেন গিরিজানন্দ এবং সহযোগিতা করছেন একদল যোগ্য, নিষ্ঠাবান শিক্ষক।

"ইংরাজী তো অকূল পাথার। ছাত্রছাত্রীরা কী করবে?"

"গ্রামার ভাল করে পড়বে। টেন্স, আর্টিকল, ভয়েস আয়ত্ত করতে হবে। আর, শিক্ষকরা অবশ্যই ভুল হওয়ার কারণ বুঝিয়ে দেবেন। তা না হলে সংশোধন পণ্ডশ্রম। ইংরাজী, বাংলা সব বিষয়েই টেক্সট বইয়ের উপর আলোচনা এমনভাবে করতে হবে যাতে যে-কোনও প্রশ্নেরই উত্তর লেখা যায়। ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির উপর জোর দেওয়া চাই। বাংলায় সাধু-চলিতের মিশ্রণ যেন না হয়। দুই বিষয়েই কিছু ভাল গল্পের বই পড়া দরকার। পড়ে গল্পটা নিজে লিখলে চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গির দৈন্য ধরা পড়বে।"

"অঙ্কে প্রতিদিন অভ্যাস দরকার। কোনও অঙ্ক একবার আটকালে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। স্টেপ বাদ যাবে না কোথাও। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে চিহ্ন বা লেখা অস্পষ্ট হলে চলবে না। অঙ্কের সব দিকেই জোর দেওয়া উচিত, কোনও একটায় নয়। বিশেষত জ্যামিতির প্রতি অনেকের একটা অ্যালার্জি থাকে। এর কারণ অনভ্যাস। অঙ্কভীতি জিনিসটার মূলেই তাই।"

বিজ্ঞান-বিষয়গুলির সম্পর্কে স্বামী গিরিজানন্দ না-বুঝে মুখস্থ করার প্রবণতার নিন্দা করলেন।

"আর, ভাল নম্বরের জন্যে?"

"অনেক বাইরের বই পড়তে হয়। ল্যাবরেটরির ব্যবহার অপরিহার্য। যেখানে সম্ভব যতগুলি সম্ভব স্কেচ দিতে হবে। ভূগোলেও প্রস্তুতি হওয়া চাই, ম্যাপ চার্ট এবং পরিসংখ্যানভিত্তিক।

শিক্ষকরা যদি কলেজের বা অনুরূপ উঁচু মানের বই থেকে নোটস লিখিয়ে দেন, তাহলে ভাল নম্বর আসতে বাধ্য। ভূগোলে গোটা প্রাকৃতিক অংশ, এবং প্রত্যেক দেশের অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও উদ্ভিদ আয়ত্ত করলেই বারো আনা কাজ হয়ে গেল।"

ভূগোলের পরই এল ইতিহাসের কথা। ইতিহাসের উত্তর হবে তথ্যপুষ্ট অথচ সংক্ষিপ্ত এবং যথাযথ। কালানুক্রমের দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। গিরিজানন্দের আক্ষেপ, বিষয় দুটিতে একটু খাটলেই ভাল নম্বর তুলতে পারা যায়, কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই তা করে না। "শুনেছেন কখনো, কেউ ইতিহাসের উত্তর লিখে প্র্যাকটিস করছে?"

"ঠিক কী স্ট্যান্ডার্ডের উত্তরে ভাল নম্বর পাওয়া যাবে?"

"সাধারণভাবে বলা যায় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে নির্ভুল, সংক্ষিপ্ত অথচ যথাযথ উত্তর যার একটা বৈশিষ্ট্য আছে। অবশ্য পর্ষৎ এখন প্রধানত অবজেকটিভ ধরনের প্রশ্নোত্তর চাইছেন। এ-ব্যাপারে তাঁদের নির্দেশ মেনে চলতে হবে। কিন্তু রচনা-ধর্মী বা এসে টাইপের প্রশ্ন তো উঠে যায়নি। কাজেই, ঐ ধরনের উত্তরও তৈরি রাখা উচিত।"

রহড়া স্কুলে একটা জিনিস দেখে আশ্চর্য হলাম। যা অন্য কোথাও আছে কি না জানি না। নাইনে ও টেনে প্রত্যেক বিষয়ের সম্ভাব্য প্রশ্নগুলি একটি বইয়ের আকারে ছাপিয়ে ছাত্রদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। না, ও দু'টি মামুলি সাজেশন বই নয়। এক-একটা বিষয়ে যত রকম প্রশ্ন হতে পারে সেগুলি একত্রিত করা হয়েছে। ঐ 'প্রিপারেশন গাইড বুক' ধরেই ক্লাসে আলোচনা হয়। ক্লাস টেনের বইটা দেখছিলাম। এক ইতিহাসেই ১৬১৭টি প্রশ্ন রয়েছে! নিঃসন্দেহে বই দুটি যে কোনও স্কুলের ঈর্ষার বস্তু।

ভাবছিলাম কতখানি ছাত্রপ্রীতি থাকলে শিক্ষকরা এই রকম কাজে হাত দেন। চমক ভাঙল স্বামীজীর কথায়। উনি বললেন, "আসলে, নিয়মিত ক্লাসের পড়া ও বাড়ির কাজ তৈরি করা, লিখে চর্চা করা ও সেই লেখা সংশোধন করিয়ে নেওয়া—এগুলিই সব। বুঝতেই পারছেন, শিক্ষকদের ভূমিকা সব ব্যাপারেই থেকে যাচ্ছে।"

আনন্দমেলা সম্পর্কে স্বামীজীর মন্তব্য : "অসাধারণ!"

চলে আসার সময় স্বামীজীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা না করে পারলাম না। "সব জায়গায় শিক্ষকদের পক্ষে কি এতটা দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব? তাঁদের নিজস্ব সমস্যা..."

"আমরা তো মনে করি ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অন্তরঙ্গতা থাকলে সবই সম্ভব। ঐ দেখুন।"

স্বামীজীর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলাম, একটি ঘরে একজন কী যেন লিখছেন একমনে। জানলাম, উনি ছেলেদের খাতা সংশোধন করছেন।

নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। বালকাশ্রমের মন্দিরে ঘণ্টা বেজে উঠল। বোধহয় সান্ধ্য উপাসনার সময় হয়েছে।

কীভাবে তৈরি হচ্ছে ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয়

"জয়দীপদা'র মত ভাল ফল করা অসম্ভব ব্যাপার"—বলল, রহড়া স্কুলের ক্লাস টেন-এর ফার্স্ট বয় তপন মিশ্র। কিন্তু বুঝতে পারলাম, 'দশের এক' হবার জন্যে চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই ওর।

"কীভাবে পড়াশোনা কর?" জিজ্ঞেস করতে জানাল, প্রত্যেক বিষয়েই টেক্সট বই খুব খুঁটিয়ে পড়ে। বড় প্রশ্নগুলোর উত্তর এমনভাবে তৈরি করে যাতে ছোট প্রশ্নোত্তর আপনা-আপনিই তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ বিষয়ের গভীরে যায় তপন। প্রিপারেশন গাইড বুক, স্কুলের অন্যান্য বছরের প্রশ্নপত্র, টেস্ট পেপার্স ইত্যাদি থেকে ও প্রশ্ন নির্বাচন করে।

"বাড়িতে কেউ সাহায্য করেন?"

"হ্যাঁ, ধরতে গেলে সবাই। বাবা দেখেন ইংরাজী। নিয়মিত টাস্কও দেন। অঙ্ক ফিজিক্স দেখেন দাদা। তিনি যাদবপুরে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র। এক দিদি বোস ইনস্টিটিউটে বায়োকেমিস্ট্রি নিয়ে রিসার্চ করেন। উনি দেখিয়ে দেন কেমিস্ট্রি।"

তপনের প্রিয় সাবজেক্ট অঙ্ক। ও বলল, "অঙ্ক না করলে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি ভূগোল ইত্যাদির মৌল ধারণাগুলি আয়ত্ত হয় না। আমার আরও সুবিধা হয় অতিরিক্ত বিষয় অঙ্ক নেওয়াতে।"

ইংরাজীতে ও গ্রামার খুব ভাল করে পড়ে। টেক্সট তো বটেই। শেক্সপীয়র, লুইস ক্যারলের মত খ্যাতনামাদের রচনা ছাড়াও তপন সানডে, সায়েন্স টুডে ও ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পড়ে। আনন্দমেলার 'লেখাপড়া' ও 'মজার পড়া' বিভাগ ওর খুব ভাল লাগে।

সংস্কৃতের কথা জানতে চাইলে বলল যে, সেভেন থেকেই ওকে আসল জায়গায় অর্থাৎ ব্যাকরণে জোর দিতে শিখিয়েছেন রাসবিহারীবাবু। বিভক্তি প্রত্যয় ইত্যাদি এখন তপনের আয়ত্তে।

"জীবন বিজ্ঞানে?"

"স্কুলের বই সুনীলেন্দু বসাক ছাড়াও তারকমোহন দাশ, কুণ্ডু-দাশ-কুণ্ডু, নন্দ-দাশ-গিরি, হরিদাস গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ পাল ও সুপ্রকাশ রায় চৌধুরী পড়ি। এক-একটা বইতে এক-একটা টপিকের ট্রিটমেন্ট ভাল।" ভূগোলে ক্লাসে পড়ানো হয় সাহা-সেন। এছাড়া ও পড়ে শিবপ্রসাদ চ্যাটার্জীর বই ও একটি নামকরা সিওর সাকসেস। আর ক্লাসে হিন্দুস্থান ইয়ার বুক, ইণ্ডিয়া ১৯৭৬ ও রামলোচন সিং প্রভৃতি বই থেকে নোটস দেওয়া হয়। তেমনি ইতিহাসে প্রভাংশু মাইতি ও কিরণ চৌধুরীর বই ছাড়াও অমলবাবুর ক্লাস নোটস অপরিহার্য বলে তপন মনে করে।

বাংলায় টেক্সট এবং স্কুলে যেসব বই বলা হয় সেগুলি ছাড়াও তপন মিশ্র রবীন্দ্রনাথ, সৈয়দ মুজতবা আলি, বিমল কর সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বই মন দিয়ে পড়ে। কারণ বাংলায় দুর্বলতা সম্পর্কে ও পুরোমাত্রায় সচেতন। হ্যাঁ, বলতে ভুলেই গেছি, তপন বাঙালী নয়। ও ওড়িশার ছেলে — বাবা সিদ্ধেশ্বর মিশ্রের কাস্টমসের বদলির চাকরির সূত্রেই ওদের পশ্চিম বাংলায় আসতে হয়েছে।

রঞ্জিতকুমার ঘোষ

ফোটো/মনোজিৎ চন্দ

(একত্রিশের পাতার পর)

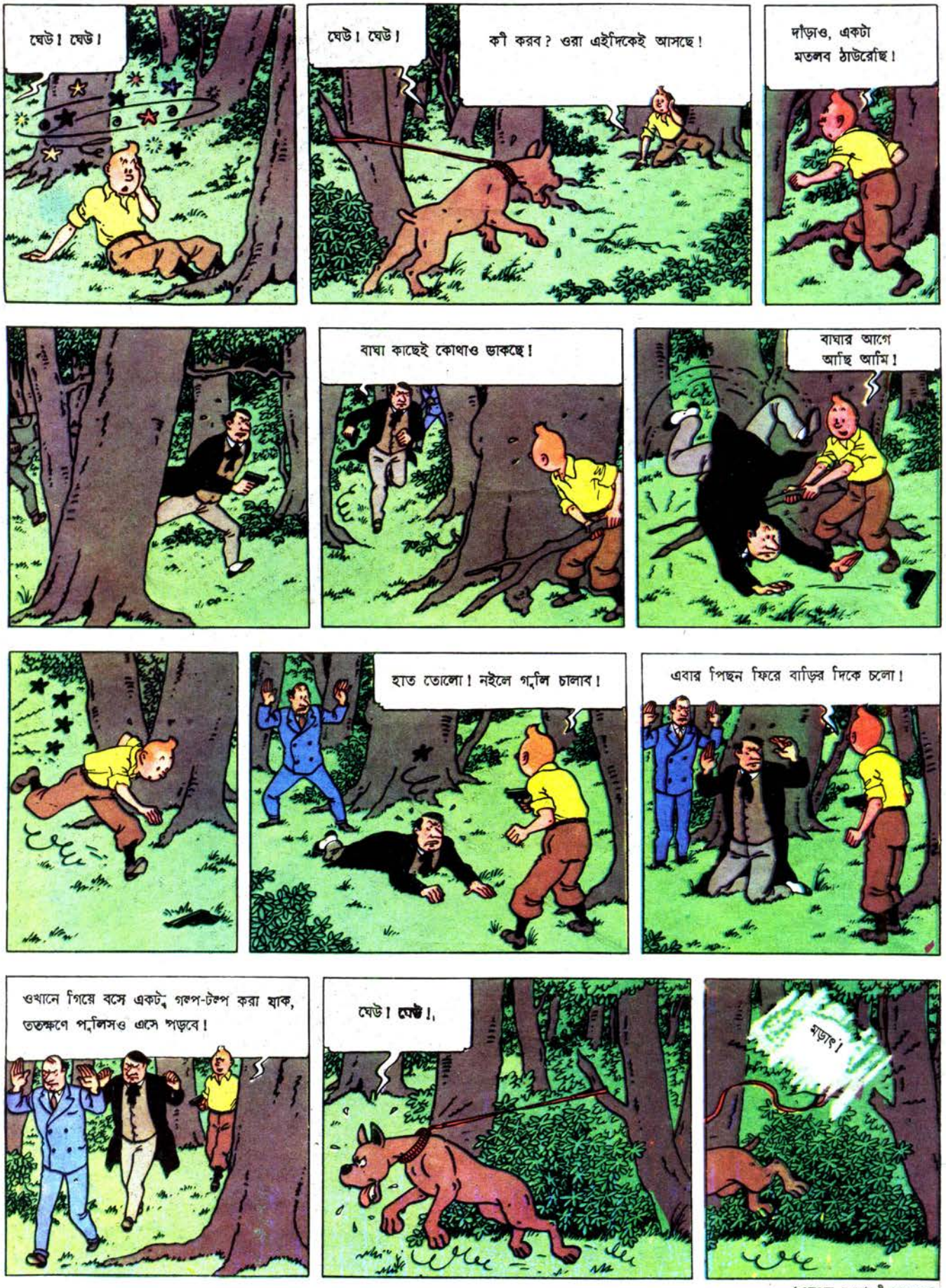

(এরপর আগামী সংখ্যায়)

ফুটবল আর ফুলকাকা

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ফুটবলের মরসুমে পপনদের বাড়িটা একটা আগ্নেয়গিরি হয়ে থাকে। পপনের কাকা পাঁচজন। পপনের ঠাকুর্দা খাস কলকাতার লোক, কট্টর মোহনবাগান-সমর্থক। পপনের বাবাও তাই। পপনের ঠাকুমা চট্টগ্রামের মেয়ে। যদিও আজন্ম কেটেছে কলকাতায়। পূব-বাংলার ভাষা জানেন না, বোঝেন না, তবুও তিনি মনে করেন ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করার একটা নৈতিক দায়িত্ব তাঁর আছে। যেহেতু পপনের বাবা মোহনবাগানের সমর্থক, সেহেতু পপনের মেজকাকা ইস্টবেঙ্গলকে সমর্থন করেন। মিঠুকাকা যন্ত্রপাতি এবং গপ্পো বানানো নিয়ে থাকতে ভালবাসেন, তাই তিনি ফুটবলের ব্যাপারে কোনো উৎসাহ দেখান না। পপনের ন-কাকা এবং রাঙাকাকা মোহনবাগান, আর ফুলকাকা ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক। ফুলকাকা ন-কাকার চেয়ে ছোট, রাঙাকাকার চেয়ে বড়, আর গলার জোরে পাড়ায় কারো কাছে ছোট নয়। পপনের ছোট বোন হেরে-যাওয়া দল একদম পছন্দ করে না, তাই যখন যে জেতে, সেই দলে থাকে। তবে একে মেয়ে, তায় নেহাত পুঁচকে, তাই পপন ওর কথা নিয়ে একদম ভাবে না। পপনের মা ময়মনসিংহের মেয়ে এবং সেজন্য খুব গর্বিত বোধ করেন। পপনের মামারা সবাই কট্টর ইস্টবেঙ্গল, মামাতো ভাইরাও তাই। পপনের মা কিন্তু খেলাধুলো নিয়ে কোনো উৎসাহ দেখান না। তাঁর মতে পপনের বাবা ঠান্ডামাথায় কথা বলতে পারেন না, সুতরাং ওসব আলোচনা না-করাই ভাল। তবু পপন লক্ষ করেছে যে, ইস্টবেঙ্গল জিতলে মা যতটা খুশি থাকেন, হারলে ততটা খুশি হন না। তা যাকগে, পপন নিজে মোহনবাগানের সমর্থক।

বাড়ি এমনিতেই সরগরম। ফুটবল-মরসুম শুরু হলে আরও সরগরম হয়ে ওঠে। লম্বা সারি দিয়ে খেতে বসেছেন ঠাকুর্দা আর বাবাকাকারা। মা-ঠাকুমা পরিবেষণ করছেন। তখন পপনের মেজকাকা শুরু করলেন, "মানুটাকে (পপনের ন-কাকা) নিয়ে খেলা দেখতে যাওয়া বিপদ। আজ শেষ মুহূর্তে যখন ইস্টবেঙ্গল গোল দিল, ও আমাকে বলছে, দেখলি মেজদা, বলটা পাস দিল একদম সাইডলাইনের বাইরে থেকে। আমি বলি, চুপ চুপ।"

পপনের ঠাকুর্দা বললেন, "গোলটার আগেই তাহলে প্রো হয়েছিল?"

পপনের বাবা মাছ বাছতে বাছতে বলেন, "সারা কলকাতা ইস্টবেঙ্গল দখল করে নিয়েছে, ওরা যা ইচ্ছা তাই করবে। সম্প্রতি নূতন নিয়ম হবে ঠিক হয়েছে, ইস্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডরা অন্য টিমের হাফ লাইনের মধ্যে ঢুকলেই গোল হয়েছে বলে গণ্য করতে হবে।"

এ-ধরনের কথা কেন জানি না ফুলকাকার একদম ভাল লাগল না। ও বলল, "তাই বল্ দাদা, তা না হলে গতবারের শীল্ডে পাঁচ গোল খাবি কেন বল্?"

পপনের বাবা পাঁচ গোলের কথাটা সেই খেলার দিন থেকেই প্রাণপণ ভোলবার চেষ্টা করছেন, তাই বললেন, "আজকের খেলা নিয়েই কথা হোক না কেন।"

পপনের মেজকাকা বললেন, "তাই হোক। তুই আজ গিয়েছিলি খেলার মাঠে যে বলছিস?"

পপনের বাবা বললেন, "আমি না যাই, মানু গিয়েছিল, তাছাড়া এ তো আর আজ নতুন হচ্ছে না।"

মিঠুকাকা বললেন, "থাক্ থাক্। তার চেয়ে বরং আজ কী কান্ড হল শোন্।"

পপনের কান খাড়া হয়ে উঠল। নতুন কোনো গপ্পো শোনা যাবে। কিন্তু ততক্ষণে ন-কাকা বলেছে, "কালকে কাগজেই দেখবি।"

আর যায় কোথা, ফুলকাকা বললেন, "খবরের কাগজগুলোর কথা আর বলিস না, সব রিপোর্টারগুলো মোহনবাগানের সাপোর্টার।"

পপনের ঠাকুমা ধমক দিয়ে বললেন, "সব চুপ করো, মন দিয়ে খাও। তোমাদের জন্য রান্না করা হবে কষ্ট করে, আর খেতে বসে খাওয়া মাথায় উঠল, পাড়া কাঁপিয়ে মোহনবাগান-ইস্ট-বেঙ্গল!"

পপনের ঠাকুর্দা বললেন, "খাবার সময় ওসব থাক।"

সেদিনের মতো মিটল।

পরের দিন কাগজের বিবরণে বলটা যে মাঠের বাইরে থেকে পাস করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে কোনো উল্লেখ ছিল না। ফুল-কাকা ওঠে খুব ভোরে। কাগজটা নিয়ে সটান ন-কাকার ঘরে চলে গেল। ঘুম থেকে উঠিয়ে বলল, "দেখাও, কোথায় লিখেছে বলটা আগেই আউট হয়ে গিয়েছিল।" ন-কাকা আধোঘুম-ঘুম অবস্থায় বলল, "লিখবে তো না-ই। সব ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার।"

পপনের বাবা-মেজকাকা আজকাল আর বেশী খেলা দেখতে যান না। যায় বেশী ফুলকাকাই। আর ফুলকাকা মাঠে যাওয়া শুরু করার পর থেকে ইস্টবেঙ্গল জিতেই চলেছে। পপন যবে থেকে খেলায় মন দিতে শুরু করেছে, তখন থেকে মোহনবাগান যেন জিততে ভুলেই গেছে। ফুলকাকা রোজ ওকে বলে, "বলছি ছেড়ে দে মোহনবাগান। ওসব পুরনো দিনের ব্যাপার। গলদা চিংড়ি যখন টাকায় আটাশটা বিকোত, রেড রোডে যখন পাল্কি চলত, তখন লোকে মোহনবাগানকে নিয়ে নাচত। এখন দুনিয়া বদলে গেছে। তুই নতুন যুগের ছেলে হয়ে মোহনবাগানকে সাপোর্ট করিস আর কেঁদে মরিস। ছোঃ ছোঃ।"

পপন চুপ করে থাকে আর বলে, "পরে দেখবে।"

কিন্তু পরে আর দেখা হয় না। মোহনবাগান কিছুতেই জিততে পারে না। পাড়ার ইস্টবেঙ্গলের দলের সঙ্গে সারা-রাস্তা নাচতে-নাচতে ফুলকাকা বাড়ি ফেরে। ঠাকুর্দা, বাবা, ন-কাকা, রাঙাকাকা গম্ভীর হয়ে থাকে। ঠাকুমা আর মা মনে মনে খুশি, বাইরে নির্লিপ্তভাবে বাবার আনা ইলিশ মাছের সর্ষেবাটা রান্না করেন। ফুলকাকা মেজকাকা মোহনবাগানের কী হল তাই নিয়ে গবেষণা করেন।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু চিরদিন তো আর সমান যায় না। ছবছর বাদে মোহনবাগান শোধ নিল। তাও পাঁচ গোল নয়, এক গোল। খেলার প্রথমেই গোল। পপনের আনন্দ আর ধরে না। রীলে শুনছে, বুকের মধ্যে ধুকপুক চলেছে। ইস্টবেঙ্গল মরীয়া হয়ে লড়ছে। পপন শুধু বলছে, "ঠাকুর ঠাকুর, খেলা তাড়াতাড়ি শেষ ক'রে দাও।"

একসময় খেলা শেষ হল। মোহনবাগান জিতেছে। পপনের তখন আর তর সইছে না। কখন ফুলকাকা বাড়ি আসবে। মনে-মনে ও প্রশ্ন তৈরি করতে থাকে। "কী, টাকায় আটাশটা গলদা চিংড়ি পেলে?" কিংবা, "গোলটা নিশ্চয় অফসাইড ছিল?" কিংবা, "ফুলকাকা, ইস্টবেঙ্গলের দিন ফুরিয়েছে, এবার ছেড়ে দাও।" এরই মধ্যে পপনের ছোট বোন খুব আহ্লাদ করে এসে বলল, "দাদাভাই, মোহনবাগান কেমন জিতল, না রে?" পপনের মনে হল লাগায় এক চাঁটা।

কিন্তু ফুলকাকা কই? মাঠ থেকে আর ফেরেই না। পাড়ার ইস্টবেঙ্গলের দল মুখ চুন করে ফিরে এল। মোহনবাগানের দল ধাঁইধাঁই করে পটকা ফাটাতে লাগল। কিন্তু ফুলকাকার পাত্তা নেই। ঠাকুরদা উদ্বিগ্ন হয়ে বারান্দায় এসে বসলেন। ফরসির নল দিয়ে ঘন-ঘন তামাক টানতে লাগলেন। পপনের বাবাও অস্থির হয়ে পড়লেন। খানিক রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ান, কখনো টেলিফোনের কাছে গিয়ে দাঁড়ান, আর ঠাকুরদাকে বোঝাতে থাকেন, "বাবা, তুমি ভেবো না, কোথাও কাম্লাকাটি করছে, এক্ষুনি আসবে।"

ফুলকাকা এল যখন, তখন প্রায় আটটা। এর মধ্যে পপনের বাবা সত্যি একবার পুলিসে টেলিফোন করেছেন এবং গজগজ করে বলেছেন, বলিহারি পুলিসের, একটা ছেলে হারিয়েছে, তা বলে কিনা যখন ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার তখন একটু দেরি করে ফিরবে, না ফিরলে এসে ডাইরি করিয়ে যাবেন। ফুলকাকাকে দেখে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। কোথায় গিয়েছিলি? দেরি করলি কেন? বাবা কত ভাবেন জানিসই তো। ফুলকাকা স্নান করে খেতে বসে বলল ওর কেন দেরি হয়েছিল। "খেলার মাঠ থেকে যখন বেরোলাম তখন মনটা ভারী খারাপ। ছ বছর বাদে এ কী কেলেঙ্কারি। আমাদের দলের সমর্থকরা সবাই মনমরা হয়ে চলে গেল। আমি যখন রাজভবনের কাছে এসেছি, তখন দেখলাম একদল মোহনবাগানের সমর্থক নাচতে-নাচতে চলেছে। মনে হল আমরাও এইভাবেই বছরের পর বছর বাড়ি ফিরেছি। তারপরই মনে হ'ল অভ্যাসটা ছাড়া ঠিক নয়। তাই ওদের দলে মিশে গেলাম। খেয়াল হল শ্যামবাজারে গিয়ে। সেখান থেকে মিনি করে এই আসছি। আসল কথা অভ্যাস বজায় রাখা।"

পপনের মেজকাকা এরপর ঝাড়া এক সপ্তাহ ফুলকাকার সঙ্গে কথা বলেননি। পপন কিন্তু ফুলকাকাকে আরও একটু বেশি ভালবাসছে।

ছবি/মদন সরকার

কাঁদিস কেন

গৌরী ধর্মপাল

কাঁদিস কেন বাবলি মানিক?
কাঁদিস কেন সোনা তুতুল?
মেলা থেকে দেখ্ এনেছি
তোদের জন্যে অ্যাত্তো পুতুল।

দেশ বিদেশের হরেক মানুষ
ওড়াচ্ছিল ঘুড়ি ফানুষ।
বাজাচ্ছিল ডুগ্‌ডুগি কেউ,
কেউ ঢাক কেউ বা কাঁসি।
বেড়াচ্ছিল আপনমনে
কেউ বা পাশাপাশি।

ভিড় কি রাতে দিনে
এই নে ঝুমঝুমি নে।
পুতুল নিয়ে আজ খেলা কর্
সাজা গোজা বাঁশি বাজা।
কাল যাব বেলাবেলি
তোদের নিয়ে দেখতে রাজা।

মনোজদের অদ্ভুত

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে

মনোজদের বাড়িতে একটি অচেনা ছেলের ছবি আছে। ছবির ছেলেটাকে মনোজের খুব ভাল লাগে। ওদের বাড়িটা সত্যিই অদ্ভুত। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাঁচিল টপকে ওদের বাড়িতে ঢোকার সময় কাকের ঠোক্কর খেয়ে উল্টে পড়লেন উঠোনে। তাঁর ছিটকে-পড়া পিস্তল লুকিয়ে পাচার হয়ে গেল পুতুলের পুতুল-খেলার বাক্সে। হরিণগড়ের রাজা গোবিন্দনারায়ণের নিখোঁজ ছেলে কন্দর্পনারায়ণের ছবির সন্ধানে এসে হতাশ হলেন বরদাচরণ। রাজামশাই বলেছেন, যার কাছে রাজকুমারের ছবি পাওয়া যাবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। তাই না শুনে মনোজের বাবা রাখোবাবু বাড়ির সবাইকে ডেকে বললেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ছবিটা খুঁজে বার করতে হবে। পুতুলের বাক্স থেকে পিস্তলটা মনোজের কাকা ভজবাবুর হাতে এল। ভজবাবুর হাতে পিস্তল দেখে গোয়ালা হরশঙ্কর ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। ভজবাবু পিস্তলের শক্তি-পরীক্ষা করতে বেরিয়ে গেলেন রাস্তায়। এদিকে, মনোজদের বাড়িতে সবাই কুমার কন্দর্পনারায়ণের ছবি খুঁজে-খুঁজে হয়রান। ছবিটা কিন্তু মনোজের বইয়ের মধ্যে। ভজবাবু পিস্তল হাতে অপমানের শোধ তুলতে গিয়ে হেড স্যার গোলোকবিহারী চক্রবর্তীর কাছে লাঞ্ছিত হয়ে খেপে গেলেন। তারপর একজন পুলিশ কনস্টেবল, তাস-খেলুড়ে, সুদখোর গোবিন্দ আর বেহিসেবী শার্দুলকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিয়ে ডাকাতের একটা দলের ওপর পিস্তল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডাকাতের দলে কানাই মাছওলা ছিল। কানাইকে ওঠবোস করাতে যাবার সময় তিনি ধরা পড়ে গেলেন মেজ সর্দারের হাতে। সর্দার বলল, একে আজ মা কালীর সামনে বলি দেওয়া হবে। কিন্তু, ঘটনাচক্রে ভজবাবু সে রাতের মতো ডাকাতদের সর্দার হয়ে গেলেন। ডাকাতি হবে রাজ-বাড়িতে। ওদিকে, দারোগা নিশিকান্ত এক দল সেপাই নিয়ে 'মার্ডারার' ভজবাবুকে ধরার জন্যে মনোজদের বাড়ি গিয়ে হাজির। কিন্তু, আদ্যাসুন্দরী দেবী কিছুতেই জুতো পরে সেপাইদের ঘরে ঢুকতে দেবেন না। বাধ্য হয়ে সেপাইরা দেয়াল টপকে ভেতরের উঠোনে নেমে পড়ল। একটু পরেই বৈজ্ঞানিক হারাধনের 'গোরিমান' অর্থাৎ অর্ধেক গোরিলা আর অর্ধেক হনুমান তাদের ছুঁড়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল। ভজবাবু ওদিকে ডাকাতের দল নিয়ে রাজবাড়িতে হাজির। খবর পেয়ে সেখানে হারাধন, গণেশবাবুরাও পৌঁছে গেছেন। দারোগা-বাবুও জেনেছেন ডাকাতপড়ার খবর। রাজবাড়িতে সে এক সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। তারপর—

১৪

রাজা গোবিন্দনারায়ণ বললেন, "তাতিরাতাচি গামা হণ্ডুরাস।"

মেজ-সর্দার অবাক হয়ে বলে, "তার মানে?"

রাজামশাই আবার বলেন, "গিমি গড়গড়ি কেরোসিন বোম।"

মেজ-সর্দার হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, "ওরে তোরা শোন তো এসে, রাজামশাই কী ভাষায় কথা বলছে!"

রাজামশাই নিজেও তা বুঝতে পারছিলেন না। তাঁর মনে হচ্ছিল বোধহয় দৈবক্রমে তিনি স্বপ্নাদ্য কোনো নতুন ভাষা শিখে ফেলেছেন। অর্থ না-বুঝলেও তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত ঐ সব কিম্ভূত কথা বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার তিনি বললেন, "গমেসি গদাধর ভাগভাস ফুংকাসুন।"

কানাই খুব মন দিয়ে শুনে বলে, "নাঃ, বোঝা যাচ্ছে না। তেলুগু হতে পারে।"

বিড়ি-চোর বলে, "তেলু টেলু নয়। আমি সেবার পাহাড়ে গিয়ে ঠিক এই ভাষা শুনে এসেছিলাম। তবে মানে বলতে পারব না।"

একটা অল্পবয়সী ডাকাত বলল, "রাজাদের ব্যাপারই আলাদা। তারা কি আর আমাদের ভাষায় কথা বলে নাকি? আর কথায় কাজই বা কী?"

মেজ-সর্দারও বলে, "ঠিক বলেছিস। এত কথায় কাজ কী? কানাই, রাজামশাইয়ের কোমরের ঘুনসি থেকে চাবির গোছাটা খুলে দে তো!"

কানাই চাবির গোছা খুলে নিল।

রাজামশাই শুধু বললেন, "সামসাদিঘি টক দৈ হামলা খামলা।" বলতে বলতে রাজামশাই তখনো অবাক হয়ে ভাবছেন যে, তাঁর মুখ দিয়ে এসব কথা বেরোচ্ছে কী করে। মনে-মনে তিনি যা ভাবছেন তা বুঝতে তাঁর অসুবিধে হচ্ছে না। কিন্তু যেই সেকথা বলতে চাইছেন অমনি তাঁর জিভ যেন বদমাইশি করে কথাগুলোকে অন্য একটা বিদঘুটে ভাষায় ট্রানসলেট করে দিচ্ছে। যেমন তিনি এখন বলতে চাইছিলেন 'বাবারা, হামলা কোরোনা, যা চাও নিয়ে যাও।' এর মধ্যে কোত্থেকে সামসাদিঘি বা টক দৈ আসে তা বোধের অগম্য।"

ডাকাতরা চাবি খুলে নিয়ে রাজামশাইকে একা রেখে চলে গেল। রাজামশাই দাঁড়ানো অবস্থাতেই মূর্ছিত হয়ে রইলেন। এটা অবশ্য তাঁর পুরনো অভ্যাস, দাঁড়িয়ে মূর্ছা যেতে তাঁর কোনো অসুবিধেই হয় না।

অন্দরমহলের একটা বড়-সড় ঘরে রাজমাতা আর রানী-মা দুটো পাশাপাশি খাটে শোন। মাঝখানে মেঝেয় শোয় রাজবাড়ির পুরনো দাসী।

রাজমাতার ভাল ঘুম হয় না। মাথায় রাজ্যের চিন্তা। সারাদিন ঘুঁটে দেন, সেই ঘুঁটে শুকিয়ে পাহাড়প্রমাণ জমিয়ে রাখেন। রাজমাতা ঘুঁটে বিক্রি করলে নিন্দে হবে, সেইজন্য নিজে না বিক্রি করে বুড়ি দাসীকে দিয়ে বিক্রি করেন। তাতে বেশ দু পয়সা আয় হয় তাঁর। কিন্তু তিনি যতই গোপন করুন রাজ্যি সুদ্ধু সবাই জানে যে, রাজমাতার ঘুঁটের ব্যবসা আছে। ঘুঁটে অবশ্য তিনি ভালই দেন, সেজন্য লোকে তাঁর প্রশংসাও করে। রাজমাতার দুশ্চিন্তা হল সেই ঘুঁটে নিয়েই। কখন কোন ফাঁকে চোর এসে ঘুঁটে চুরি করে নিয়ে যায়, তা ভেবে রাতে তাঁর ঘুম হয় না। এ রকম কয়েকবারই চুরি গেছে। কতবার ছেলে গোবিন্দনারায়ণকে বলেছেন, "আমাকে একটা নেড়ী কুকুর এনে দে, পুষি। সে আমার ঘুঁটে পাহারা দেবে।" কিন্তু তাঁর রাজা-ছেলে সে-কথা কানে নেয়নি।

রাজমাতার আরো দুশ্চিন্তা একমাত্র নাতিটার কথা ভেবে। সে যে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে রইল!

এইসব ভেবে তাঁর ঘুম আসে না। রাতবিরেতে জেগে

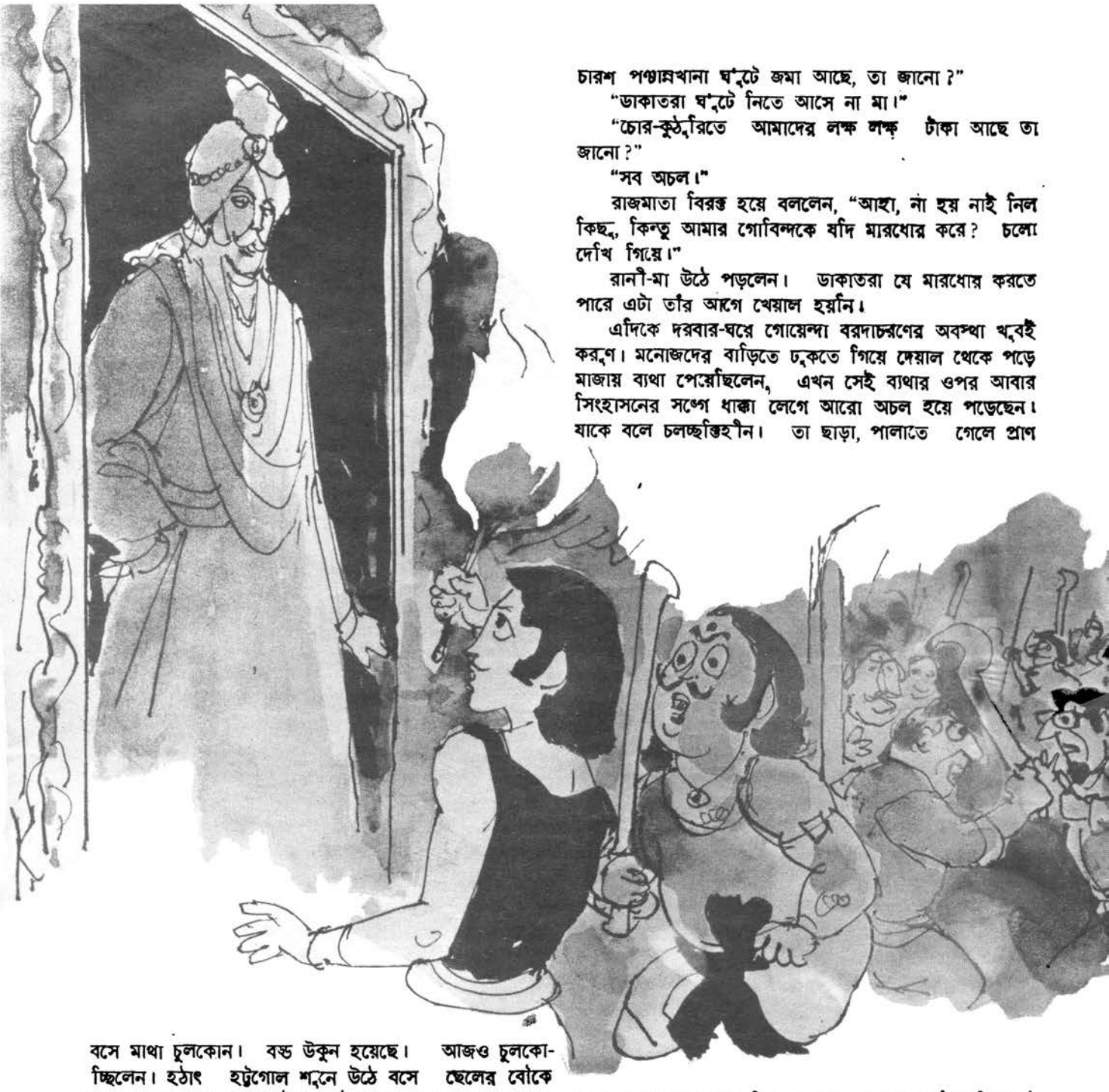

বসে মাথা চুলকোন। বড্ড উকুন হয়েছে। আজও চুলকো-চ্ছিলেন। হঠাৎ হট্টগোল শুনে উঠে বসে ছেলের বৌকে ডাকতে লাগলেন, "অ বৌমা, ওঠো তো! ও কারা গণ্ডগোল করছে?"

রানী-মারও ঘুম নেই। এক কথা, ছেলে নিরুদ্দেশ। তাছাড়া কিপটে রাজার ঘর করেন বলে তাঁকে সবসময় সংসারের নানা দুশ্চিন্তা করতে হয়। ঘুম তাঁরও হয় না। শাশুড়ীর গলা শুনে বললেন, "শুনছি মা। মনে হচ্ছে ডাকাত-টাকাত পড়েছে।"

"হায় ভগবান! ডাকাতই যদি পড়েছে তবে শুয়ে আছ কেন? ওঠো দেখি কী হল!"

রানী-মা নিশ্চিন্ত গলায় বললেন, "উঠে হবেই বা কী! ডাকাতরা ঘুরে ফিরে নেওয়ার মতো জিনিস না-দেখে নিজেরাই লজ্জা পেয়ে ফিরে যাবে।"

রাজমাতা মশারি তুলে বেরিয়ে আসতে-আসতে বললেন, "নেওয়ার জিনিস নেই মানে? এখনো আমার তিন হাজার চারশ পঞ্চান্নখানা ঘুটে জমা আছে, তা জানো?"

"ডাকাতরা ঘুটে নিতে আসে না মা।"

"চোর-কুঠুরিতে আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকা আছে তা জানো?"

"সব অচল।"

রাজমাতা বিরক্ত হয়ে বললেন, "আহা, না হয় নাই নিল কিছু, কিন্তু আমার গোবিন্দকে যদি মারধোর করে? চলো দেখি গিয়ে।"

রানী-মা উঠে পড়লেন। ডাকাতরা যে মারধোর করতে পারে এটা তাঁর আগে খেয়াল হয়নি।

এদিকে দরবার-ঘরে গোয়েন্দা বরদাচরণের অবস্থা খুবই করুণ। মনোজদের বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে দেয়াল থেকে পড়ে মাজায় ব্যথা পেয়েছিলেন, এখন সেই ব্যথার ওপর আবার সিংহাসনের সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরো অচল হয়ে পড়েছেন। যাকে বলে চলচ্ছক্তিহীন। তা ছাড়া, পালাতে গেলে প্রাণ যাবে বলে ভজবাবু শাসিয়ে রেখেছেন। সে-কথাটা অবিশ্বাসই বা করেন কী করে? ভজবাবুর হাতে খাঁড়া, ভাবসাবও ভাল নয়।

বরদাচরণ মেঝেয় পড়ে ব্যথায় কোঁকাচ্ছেন আর তাঁর দু পাশে দাঁড়িয়ে ভজবাবু আর গণেশ ঘোষাল প্রচণ্ড ঝগড়া করছেন। ঝগড়া করতে-করতে উত্তেজিত ভজবাবু মাঝে মাঝেই খাঁড়া বাঁইবাঁই করে ঘোরাতে থাকেন। তাতে বরদা-চরণ ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, "দোহাই ভজবাবু! খাঁড়া সামলে। নাকে মুখে লেগে যাবে যে!"

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ভজবাবু বুক চিতিয়ে বলছেন, "এঃ! বলে সারে-গামা জানি না! আপনি জানেন? করুন দেখি সারেগামা!"

গণেশ ঘোষালও বুক চিতিয়ে বলেন, "সারেগামা আমাকে করতে বলছেন, ভাল কথা। কিন্তু করলে বুঝবেন কি?

গানের "গ"ও তো জানেন না। অথচ আজ প্রকাশ্যে সুরের অপমান করে সারা শহর ঢি ঢি ফেলে দিয়েছেন।"

রাগে ভজহরিবাবু বাঁইবাঁই করে আরো কয়েকবার খাঁড়া, ঘোড়ালেন। আতঙ্কে চিঁচিঁ করে বরদাচরণ বলতে থাকেন, "খাঁড়া সামলে, ভজবাবু! আর-একটু হলে—"

গণেশ ঘোষাল একটু ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলেন, "হ্যাঁ, ঐ খাড়া ঘোরানো, পিস্তল দিয়ে ভয় দেখানো, এসবই আপনাকে তবু মানায়। কিন্তু গান নয়। শুনুন।" এই বলে গণেশবাবু খুব আবেগ দিয়ে বাঁ হাতে নিজের বাঁ কান চেপে ধরে ডান হাতটা ভজবাবুর মুখের সামনে একটু খেলিয়ে তান ধরলেন, "সা.. ...রে.....গা.....মা, কোন্ স্কেলে ধরেছি বলুন তো!"

ভজবাবু একটু থমকে গিয়ে বলেন, "স্কেল? গানের মধ্যে আবার স্কেল কী মশাই? এ কি হাতের লেখা নাকি যে রুল টানতে স্কেল চাই! নাকি গলার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মেপে দেখবেন!"

"হাঃ হাঃ। বেনাবনে মুক্তো ছড়ানো। স্কেল কাকে বলে তা-ই যখন জানেন না, তখন আর গেয়ে হবেটা কী? তবু গানের মধ্যে যে সম্মোহনী শক্তি আছে তাতে আপনার মতো অ-সুর লোকেরও হয়তো উপকার হতে পারে। তাই শোনাচ্ছি! শুনুন, সা.....রে.....গা.....মা....."

ডাকাতদলের প্রচণ্ড চেঁচামেচি, গণেশবাবুর গলা সাধা, বরদাচরণের ক্ষীণ আর্তনাদ মিলেমিশে সে এক বিটকেল কাণ্ড।

মেজ-সর্দার তার কয়েকজন স্যাঙাত নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ একবার থমকে দাঁড়িয়ে সর্দার তার মশালটা তুলে দেয়ালে একটা মস্ত তৈলচিত্র দেখে কানাইকে বলল, "ওটা কার জানিস?"

কানাই বলে, "কার?"

মেজ-সর্দার শ্বাস ফেলে বলে, "আমিও জানি না। তবে খুব চেনা-চেনা ঠেকছে। এ পুরো বাড়িটাই আমার খুব চেনা লাগছে।"

কানাই উৎসাহ পেয়ে বলে, "তবে চোর-কুঠুরিটা কোথায় তা খুঁজে বের করে ফেল।"

মেজ-সর্দার ধমক ছেড়ে বলে, "চোপ! চোর-কুঠুরি চোর-কুঠুরি করে গলা শুকোবি না। আগে আমাকে সব দেখতে দে।"

কানাই ভয় খেয়ে চুপ করে যায়।

অন্য সব ডাকাতরা যে যার নিজের কাজে ব্যস্ত। একটা লোভী ডাকাত রান্নাঘরে ঢুকে জলে ভেজানো ভাত খেতে ব্যস্ত। একজন বাসনকোসন বস্তায় ভরছে। আর-একজন রাজবাড়ির যত জামাকাপড় সরাচ্ছে। চারদিকেই খুব হাল্লা-চিল্লা।

বিড়ি-চোর বলল, "মেজ-সর্দারের ডাকাতির দিকে মন নেই।"

কানাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "বড়-সর্দারও তাই বলে।"

"কী বলে?"

"বলে, মেজটা ভদ্রঘরে জন্মেছিল। তারপর আট-দশ বছর বয়সে বাড়ি থেকে ভেগে পড়ে। হরিণগড় রেলস্টেশনে গাড়িতে উঠতে গিয়ে পড়ে মাথা ফেটে যায়। সেই থেকে হারানো কথা মনে করতে পারে না। তবে সেই গাড়িতে বড় সর্দার কাশী যাচ্ছিল তীর্থ করতে। মেজ-সর্দার কোন্

বাড়ির ছেলে তা সে বুঝতে পেরেছিল। সে-ই টেনে ট্রেনের মধ্যে ছেলেটাকে তুলে নেয়। মাথায় মতলব ছিল যে, ছেলেটাকে লুকিয়ে রেখে তার বাপের কাছ থেকে মোটা টাকা আদায় করবে। কিন্তু সে আর হয়নি। বড় সর্দারের বৌয়ের ছেলেপুলে ছিল না, সে ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতো করে বুকে আগলে রাখল। পাছে ছেলেটাকে তার মা-বাবা কোনোদিন চিনতে পেরে দাবি করে বসে সেই জন্য পরে বৌয়ের আবদারে তীর্থ থেকে ফিরে এসে ছেলেটার বাড়ি থেকে তার সব ছবি চুরি করে নিয়ে যায়। ওঁদকে বড়-সর্দারের মতি ফেরানোর জন্য তার বৌ তীর্থে-তীর্থে ঘুরে বেড়াত খুব। সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেটাকেও রাখত। তা বড়-সর্দারের মতিগতি ভালর দিকেই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু বছর দুই আগে যেই বৌ মরল অমনি আবার পুরনো পোকা মাথায় কিলবিল করে উঠল। সর্দার আমাকে গোপনে বলেছে, ছেলেটার বাবার অবস্থা এখন পড়তির দিকে। টাকা চেয়েও লাভ হবে না। তার চেয়ে ছেলেটাকে ডাকাতির তালিম দিয়ে ছেড়ে দিলে বুড়ো বয়সে দুটো পয়সার মুখ দেখা যাবে।"

বিড়ি-চোর বড়-বড় চোখ করে গল্প শুনছিল। একটা ঢোঁক গিলে বলে, "তাহলে মেজ-সর্দার কোন্ বাড়ির ছেলে?"

"সে কথা সর্দার প্রাণ গেলেও বলবে না।"

"আমার তো সন্দেহ হয়—"

"আমারও হয়। কিন্তু কথা চেপে রাখ। নইলে গোলমালে পড়বি।"

মেজ-সর্দার রাজবাড়ির দেয়ালে-দেয়ালে অয়েল পেইন্টিং দেখে দেখে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিছনে ডাকাতের দল, কিন্তু তারা সর্দারের ভাব-সাব দেখে কিছু বুঝতে পারছে না। ছবি দেখবে তো পটের দোকানে গিয়ে যত খুশি দেখ, না হয় একজিবিশনে যাও, ডাকাতি করতে এসে ছবি দেখার কথা তারা জন্মে শোনেনি।

একসময়ে ছবি দেখা শেষ করে মেজ-সর্দার গম্ভীর ভাবে বলে, "হুঁ।"

কানাই গলা বাড়িয়ে বলে, "কিছু বুঝলে সর্দার?"

মেজ-সর্দার গম্ভীর মুখে বলে, "চোর-কুঠুরি কোথায় তা এবার জলের মতো বুঝতে পারছি। এই পুব দিকের দেয়ালে এ-বংশের তৃতীয় রাজা হেরম্বনারায়ণের ছবি। এ ছবিতে হেরম্বনারায়ণের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটা যেদিকে বেঁকে আছে সেটা হল চোর-কুঠুরিতে যাওয়ার প্রথম পথ। পথটা অন্দরমহলে গেছে। সেখানে গোঁসাঘরের বাইরের দেয়ালে পঞ্চম রাজা ভীমনারায়ণের ছবি আছে, তাঁর ডান হাতের তর্জনী চোর-কুঠুরিতে যাওয়ার দ্বিতীয় পথটা চিনিয়ে দেবে। সে পথ ধরে গেলে একটা মস্ত শোবার ঘর পাওয়া যাবে। সেখানে দেওয়ালে নবম রাজা পবননারায়ণের ছবিটা ভাল করে দেখলে দেখা যাবে যে, তিনি মেঝের দিকে তাকিয়ে ভ্রু কুঁচকে কী যেন খুঁজছেন। অর্থাৎ আমাদেরও মেঝেতেই খুঁজতে হবে। মেঝেটা ভাল করে খুঁজলে কয়েকটা সূক্ষ্ম চিহ্ন দেখা যাবে। সেগুলো অনেকটা তীরের ফলার মতো। সেই চিহ্ন ধরে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলে খাটের তলায় এক জায়গায় গুপ্ত দরজা দেখা যাবে।"

সবাই অবাক! কানাই বলে "কী করে বুঝলে এত সব?"

মেজ-সর্দার ভ্রু কুঁচকে বলে, "কে জানে কী করে বুঝলাম! কিন্তু আমার সব মনে পড়ে যাচ্ছে যেন।"

বিড়ি-চোর বলে, "সর্দারের মাথা খুব পরিষ্কার।"

মেজ-সর্দারের পিছু পিছু ডাকাতরা এগোতে লাগল।

ঠিক এই সময়ে একটা বিশাল কালো চেহারা এক তলা থেকে এক লাফে রাজবাড়ির দোতলায় উঠে গেল। দরবার-ঘরের দরজা থেকে একটা টর্চের ঝলকানি এল, সেই সঙ্গে গুড়ুম করে গুলির শব্দ।

গণেশবাবু ভৈরবীতে চমৎকার বিলম্বিত করছিলেন। গুলির শব্দ হতেই তিনি দড়াম করে মেঝেতে পড়ে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন।

ভজবাবু খানিকটা হতভম্ব হয়ে রইলেন। ডাকাতদের কারো বন্দুক-পিস্তল নেই, তিনি জানেন। তবে কি পুলিস? সন্দেহ হতেই ভজবাবু বিপুল বিক্রমে খাঁড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বীরদর্পে কবিতা আবৃত্তি করতে লাগলেন।

কে যেন সতর্ক গলায় ডাকল, "ছোড়দা!"

আর একজন বলল, "মেজ কাকু!"

মেঝে থেকে বরদাচরণ বললেন "দোহাই ভজবাবু!"

ভজবাবু একটু থমকে গেলেন। তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, "নহি দাদা, নহি আমি কারো মেজকাকু। সম্মুখ-সমরে আত্মীয়তা ঘোর দুর্বলতা। ছাড়ো দ্বার, যাবো অস্ত্রাগারে..."

মেঝে থেকে বরদাচরণ প্রায় কেঁদে ফেলে বললেন, "ভজবাবু, দোহাই আপনার, শিগগির শুয়ে পড়ুন যদি বাঁচতে চান। একটা লাশ পড়েছে, আপনাকেও গুলি করবে।"

দরজার কাছ থেকে হারাধন বলে ওঠে, "কারো লাশ পড়েনি। গুলি আমি ছাদে চালিয়েছি।"

বরদাচরণ বলেন, "তাহলে গণেশবাবু?"

বিখ্যাত লেখক বিমল করের

দারুণ গা-ছমছম উপন্যাস

অলৌকিক

আগামী সংখ্যা থেকে

ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে

"গণেশবাবু ভয়ে পড়ে গেছেন। ছোড়দা, খাঁড়াটা ফেলে দাও। যে-কোনো মুহূর্তে পুলিস এসে পড়বে। হাতে খাঁড়া দেখলে উপায় নেই।"

ভজবাবুর মাথাটা একটু-আধটু করে পরিষ্কার হচ্ছে। তিনি যেন বুঝতে পারছেন, নিজেকে তিনি যা ভাবছেন আসলে তিনি তা নন। কোথায় একটা কিছু গণ্ডগোল হয়েছে, এমন সময় বরদাচরণ অন্ধকারে সুযোগ বুঝে পট করে তাঁর হাত থেকে খাড়াটা নিয়ে নিলেন।

খাঁড়া হাতছাড়া হতেই ভজবাবু ভারী ভিতু আর ভাল-মানুষ হয়ে গেলেন। চোখ মিটমিট করে বললেন, "ইয়ে, আমার ভারী খিদে পেয়েছে।"

ওদিকে অনেক খুঁজে পেতে মেজ-সর্দার আর তার দল-বল অন্দরমহলে সেই শোবার ঘরে ঢুকেছে। চোর-কুঠুরিতে পৌঁছতে আর দেরি নেই। রাজা পবননারায়ণের চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে মেঝেতে চিহ্ন খুঁজতে হবে। ডাকাতরা জয়ধ্বনি দিচ্ছে মেজ-সর্দারের। একটু বাদেই লক্ষ-লক্ষ টাকার মুখ দেখবে তারা। দেরি নেই।

বিশাল ঘরটায় চার কোণে চারটে আর মেঝেয় একটা খাট পাতা। ডাকাতরা ঢুকে দেখে, মাঝখানের খাটে রাজমাতা আর রানী বসে আছেন। মুখে-চোখে আতঙ্ক।

রাজামাতা ডুকরে উঠে বললেন, "ওরে, আমার গোবিন্দকে তোরা কী করেছিস?"

মেজ-সর্দার গম্ভীর গলায় বলে, "সে ভাববেন না ঠাকুমা, রাজামশাই দাঁড়িয়ে আছেন সামনের দিকের বারান্দায়।"

"আর আমার ঘুঁটে? কাল যে নন্দী-বাড়ির চাকর পাঁচশো ঘুটে নিতে আসবে।"

"দেবেন। ঘুঁটে আমরা নিই না। আমরা টাকা সোনা আর দামী জিনিস নেব। আপনারা ঘর ছেড়ে দিন। এখন মেলা কাজ আছে আমাদের। চোর-কুঠুরির গুপ্ত দরজা খুঁজে বের করতে হবে।

রানী-মা শ্বাস ফেলে বললেন, "সে আর খুঁজতে হবে না বাছা, পূর্ব-দক্ষিণ কোণের ঐ খাটটা সরালেই দেখতে পাবে। চোর-কুঠুরির দরজা খোলাই আছে। কিন্তু নেওয়ার কিছু নেই। লাখ লাখ অচল টাকা। যাও নিজেরাই দেখে এসো গে।"

"অচল টাকা?" মেজ-সর্দারের মুখটা খানিকক্ষণ থমথম করে। কী একটু ভাবে সে। তারপর মাথা নেড়ে বলে, "তাই বটে। অচলই হওয়ার কথা। আমি ছেলেবেলায় দেখেছি ওসব টাকা বহুকালের পুরনো। তখনই বোধ হয় বাজারে চলত না। এখন তো আরো চলবে না।"

রানী-মা ভ্রু কুঁচকে বলেন, "ছেলেবেলায় দেখেছ মানে? তুমি কি বাবা এ-বাড়িতে এসেছ কখনো?"

"মনে হয় যেন এসেছি। সবই চেনা লাগছে।"

রানী-মা উদ্বেল হয়ে বললেন, "তুমি একটু কাছে এসো তো বাবা, তোমার মুখখানা একটু ভাল করে দেখি। ও আমার ডাকাত-ছেলেরা, তোমরা একটু মশালগুলো ভাল করে ধরো তো।"

রাজা গোবিন্দনারায়ণের মূর্ছা হঠাৎ ভাঙল। কারণ, কে যেন তাঁর ঘাড়ে আর মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছিল। মূর্ছা ভেঙে তিনি হাই তুলে পিছু ফিরতেই আবার মূর্ছা গেলেন। এবং দাঁড়িয়ে। তার কারণ হারাধনের কিম্ভূত এবং অতিকায় গোরিমানটা গোবিন্দনারায়ণকে শুঁকে দেখছিল।

গোবিন্দনারায়ণকে ও রকম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গোরিমানটা বিরক্ত হয়ে তাঁকে ছেড়ে ভিতরবাগে চলল। একটা ছ্যাঁচড়া ডাকাত টুলের ওপর উঠে রাজবাড়ির একটা দেয়াল থেকে পুরনো একটা দেয়ালঘড়ি খুলে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। গোরিমানটা পিছন থেকে গিয়ে টুলটা ধরে অল্প অল্প ঝাঁকাতে লাগল। ডাকাতটা পিছু না ফিরেই বলল, "ঝাঁকাস না বাপ! ঘড়িটা বেচে যা পাব তা দু-জনের ভাগ।"

গোরিমানটা আরো জোরে ঝাঁকায়।

ডাকাতটা পেল্লায় একটা ধমক দিয়ে ভাল করে না-দেখেই পিছনে একটা লাথি চালিয়ে দিল। সে ভেবেছিল তার স্যাঙাতদেরই কেউ হবে।

গোরিমান লাথি খেতে পছন্দ করে না। তাই সে খুব গম্ভীরভাবে টুলটা টেনে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ডাকাতটা মাটিতে পড়ে পেল্লায় চেঁচাতে থাকে। বিরক্ত গোরিমান তাকে তুলে বগলে থার্মোমিটারের মতো চেপে ধরে চারদিকে ঘুরে দেখতে লাগল।

রাজবাড়ির ফটকে ততক্ষণে পুলিসের গাড়িটাড়ি সব এসে পৌঁছেছে। একটা জীপগাড়ি থেকে অতি সাবধানে

সুলেখা কলার বক্সের রং দিয়ে ছবিটি রাঙিয়ে তোল

নামতে নামতে নিশি দারোগা বললেন, "কালী, কালী! ওরে, তোরা সব সাবধানে চারদিক দেখে-টেখে এগো। আমার আজ শরীরটা ভাল নেই। বড্ড হাই উঠছে।"

সন্ধেবেলা গোরিমানগুলোর হাতে নাকাল হয়ে সেপাইরাও একটু ঠান্ডা মেরে গেছে। বন্দুক বা লাঠি হাতে থাকলেও তারা খুব সাহস পাচ্ছে না। একজন সেপাই বলে উঠল, "বড়বাবু, আপনার শরীর খারাপ হলে আমারও খারাপ। পেটটা তখন থেকে বকম বকম করছে।"

আর একজন সেপাই বলে দিল, "আমরা যখন জাম্বুবানের হাতে ধোলাই খেলাম, তখন আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে গল্প করছিলেন বড়বাবু। এবার না জানি আবার কার পাল্লায় পড়ি, এবার দয়া করে আপনি আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে থাকুন।"

নিশি দারোগা বললেন, "কালী কালী। চল দেখি।"

বলে খুব অনিচ্ছেয় তিনি টর্চ আর রিভলবার বাগিয়ে সাবধানে রাজবাড়ির ফটক পার হয়ে ঢুকলেন।

ওঁদিকে রানী-মা চার-পাঁচটা মশাল আর সেজবাতির আলোয় মেজ-সর্দারের মুখ দেখছেন। আর মেজ-সর্দার, যার ভয়ে গোটা গঞ্জ কাঁপে, ডাকাতরাও যাকে যমের মতো ডরায়, সেই মহাতেজী মেজ-সর্দার রানী-মার খাটের পাশে মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসে খুব লজ্জা-লজ্জা ভাব করে রানী-মাকে নিজের মুখ দেখতে দিচ্ছে।

এসব ব্যাপারে অধৈর্য হয়ে বিড়ি-চোর চোর-কুঠুরিতে যাবে বলে খাটের নীচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকেছিল, কানাই তার ঠ্যাং ধরে টেনে এনে খুব ঘা-কতক দিয়ে বলল, "সর্দারের হুকুম হয়নি, তার আগেই ঢুকছিলি যে বড়? দেব গর্দান নামিয়ে?"

বিড়ি-চোরও তেড়িয়া হয়ে বলে, "আমিও গর্দান নামাতে জানি।"

দুজনে তুমুল ঝগড়া লেগে পড়ল।

সে গোলমালে অবশ্য রানী-মা বা মেজ-সর্দারের কান নেই। রানী-মা ডাকাতের সর্দারের মাথায় হাত বুলোতে-বুলোতে বললেন, "ভাবতেও ভয় করে, যদি সত্যি না হয়! কিন্তু বাবা, তুমি যদি আমার হারানো ছেলে কন্দর্পনারায়ণ হতে!"

রাজমাতাও বললেন, "আহা, যদি আমার নাতি কন্দু এখন ফিরে আসত!"

ঠিক এই সময়ে পিস্তল হাতে হারাধন, খাঁড়া হাতে গোয়েন্দা বরদাচরণ এবং ছবি হাতে মনোজ ঘরে এসে ঢুকল।

বরদাচরণ মনোজের হাত থেকে ছোঁ মেরে ছবিটা কেড়ে নিয়ে হাঃ হাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, "মহারানী, হওয়া-হওয়ির কথা আর বলবেন না। আপনার সামনে ঐ যে ডাকাত দলের সর্দার বসে আছে, সে-ই হল আপনার হারানো ছেলে কুমার কন্দর্পনারায়ণ। আগে দেখুন এই ছবিটা কুমার কন্দর্পের ছবি কিনা!"

রানী-মা বরদাচরণের মতোই হুবহু ছোঁ মেরে ছবিটা কেড়ে নিয়ে দেখেই বলে উঠলেন, "বলো কী বাবা গোয়েন্দা! এই তো আমার কন্দর্পর ছবি! সেবার আমরা দেওঘরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কন্দর্প দুধের গেলাশ পাশে রেখে ছবি তুলতে বসেছিল, পিছনের ঘরে পর্দার আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে দেখছি। হতচ্ছাড়া বেড়ালটা তখন কোত্থেকে এসে দুধটা খেয়ে যাচ্ছিল ...হুবহু সব মনে পড়ে যাচ্ছে যে।"

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "এবার ছবির সঙ্গে

ডাকাতের সর্দারকে মিলিয়ে দেখুন।"

রানী-মা মেজ-সর্দারকে কাছে টেনে "ও আমার কন্দু রে" বলে কেঁদে ফেললেন।

মেজ-সর্দার বিড়বিড় করে বলল, "তাই সব এত চেনা-চেনা লাগছিল বটে!"

বরদাচরণ 'হেঃ হেঃ' করে হেসে বললেন, "কত বুদ্ধি খাটিয়ে যে ব্যাপারটা ধরতে পেরেছি তা আর বলার নয়।"

হারাধন ধমক দিয়ে বলে, "বেশী বোকো না। মেজ-সর্দারকে রাজকুমার বলে প্রথম যে চিনতে পারে সে হল আমার ভাইপো মনোজ।"

বরদাচরণ লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ মনোজেরও যথেষ্ট অবদান আছে। এসো মনোজ, এগিয়ে এসো।"

মনোজ এগিয়ে আসে। রানী-মা তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে করতে বললেন, "সবাই শোনো তোমরা, রাত এখন যতই হোক, আমার ঘরে আজ অনেক ঘি আর ময়দা আছে। গতকাল আমাদের একটা তালুক থেকে জিনিসপত্র অনেক এসেছে। আমি এখন সবাইকে লুচি ভেজে খাওয়াব। আমার ডাকাত ছেলেদের কয়েকজন চলো গিয়ে একটু ময়দা মেখে দেবে।"

ডাকাতরা অবস্থা বুঝে যে যার হাতের অস্ত্রশস্ত্র এদিক ওদিক ফেলে দিয়ে ভাল মানুষের মতো ব্যবহার করছিল। মেজ-সর্দার যে রাজকুমার তা জানলে তারা কক্ষনো রাজবাড়িতে ঢুকত না। কানাই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, "রাত খুব বেশী হয়নি রানী-মা। মোটে সাড়ে বারোটা, ময়দা মাখতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না।"

ঠিক এই সময় নিশি দারোগা পিছন থেকে বলে উঠলেন, "হ্যান্ডস আপ।"

কেউ হাত তুলল না। হারাধন বলে উঠল, "আহা দারোগা-বাবু, এখানে কোনো গন্ডগোল হচ্ছে না।"

বরদাচরণও বললেন, "একটা হ্যাপি এন্ডিং হচ্ছে নিশি-বাবু, এখানে রসভঙ্গ করবেন না।"

রানী-মা বললেন "ও বাবা নিশি, লুচি হচ্ছে, সবাই খেয়ে যাবে।" বলে মহারানী চারজন ডাকাতকে সঙ্গে নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেলেন।

দারোগাবাবু খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "আমি সবাইকে হাত তুলতে বলেছি, সেকথা কারো কানে যাচ্ছে না নাকি?"

কিন্তু কেউ নিশিবাবুকে তেমন পাত্তা দিতে চাইছে না। বরদাচরণ তাঁকে বোঝাতে লাগলেন, "আপনার আসবার কোনো দরকারই ছিল না নিশিবাবু, আমি একাই সিচুয়েশনটা সামলে নিয়েছিলাম! হেঃ হেঃ!"

এদিকে রাজামশাইয়ের মূর্ছা আবার ভেঙেছে। ভেঙেছে অন কিছুতে নয়, গাওয়া ঘিয়ে লুচি ভাজার গন্ধে। শিউরে উঠে তিনি আপন মনে বললেন, "আবার গাওয়া ঘিয়ের লুচি?"

রাজবাড়ির পুরনো চাকর দৌড়ে এসে খবর দিল, "রাজা-মশাই, কুমার কন্দর্পনারায়ণ ফিরে এসেছেন। শিগগির যান, রান্নাঘরে রানী-মার কোল ঘেঁষে বসে কেমন লুচি খাচ্ছেন দেখুন গে।"

রাজা গোবিন্দনারায়ণ খানিকটা হতভম্ব থেকে তারপর তাড়াতাড়ি রান্নাঘরের দিকে এগোলেন।

শেষ

ছবি/সুধীর মৈত্র

ছবির ব্যাপার

সুনীলকান্তি সেনগুপ্ত

বহু খেটে মতিলাল মিত্র
এঁকেছেন একখানা চিত্র।
তাই দেখে সুধাময় বসু,
শুধোলেন, "এটা কোন পশু?"
পাশ থেকে পরাশর ঘোষ,
ঘোষণা করেন, "এটা মোষ।"
প্রফেসর বলীন্দ্র রায়,
বলেন, "হায়না হেঁটে যায়।"

তারিণীকুমার তলাপাত্র,
বড় শিল্পীর তিনি ছাত্র,
চশমা লাগিয়ে নিয়ে নাকে,
ঘুরে ফিরে দেখে ছবিটাকে,
এইমতো অভিমত দ্যান্—
"পাখিডারে পশু কন ক্যান?"

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা শাখাকেন্দ্রগুলি ২৫ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব এবং ১১ জ্যৈষ্ঠ বিদ্রোহী কবি কাজি নজরুল ইসলামের জন্ম-জয়ন্তী নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। এই উপলক্ষে মণিভাইবোনেরা বৈতালিক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করে। ২৭ বৈশাখ ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্তের জন্মোৎসব বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালন করা হয়। ১৬ জ্যৈষ্ঠ আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের পরলোক গমনে মণিভাইবোনেরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে।

আঞ্চলিক সংবাদ

বজবজ আঞ্চলিক কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতায় নবাংকুর, বজবজ ও চলান্তিকা মণিমেলা যথাক্রমে প্রথম তিনটি স্থান অধিকার করে।

ঋণ সন্দেশ

কলকাতার যাদবপুর কলোনি মণিমেলার ৩৬তম প্রতিষ্ঠা দিবস নানা অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে পালিত হয়। কৃষ্ণনগরের নজরুল মণিমেলার উদ্বোধন করেন জেলা শাসক শ্রীমতী রানু ঘোষ। পশ্চিম দিনাজপুরের শ্রাবণী মণিমেলা কয়েকটি অনুষ্ঠানে শারীর ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শন করে বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে। ইন্দো-সোভিয়েট মৈত্রী সোসাইটি আয়োজিত লোকনৃত্য প্রতি-যোগিতায় গাইঘাটার সূর্য সেন স্মৃতি মণিমেলা প্রথম স্থান অধিকার করে। এই মণিমেলা একদিনের জন্য এক শিক্ষণ শিবিরেরও আয়োজন করেছিল। কলকাতার বিজয়গড় মণিমেলার ২৩তম বার্ষিক উৎসব পালিত হল। যাদবপুরের বিবেক মণিমেলা হোটরে একদিন বনভোজন করে এল। আসানসোলের পথিকৃৎ মণিমেলার প্রথম বার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে। এরা সম্প্রতি বক্রেশ্বর ও দুবরাজপুরে এক শিক্ষা ভ্রমণে গিয়েছিল। মধ্যম-গ্রামের বিধান মণিমেলার প্রতিষ্ঠা উৎসব সম্প্রতি পালিত হয়েছে। এরা শান্তিনিকেতনে এক শিক্ষাভ্রমণেও গিয়েছিল। ২৪ পরগণার গড়িফা মণিমেলার পঞ্চম বার্ষিক উৎসব পালিত হল। এরা বেলুড়মঠ, পরেশনাথের মন্দির প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাভ্রমণে গিয়েছিল। বেহালার দক্ষিণপল্লী মণিমেলার ১৯তম বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হল। দমদমের পূর্বাচল মণিমেলা স্থানীয় বিদ্যালয়গুলির জন্য একদিনের এক শিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছিল। হুগলীর আরামবাগ বিবেকানন্দ মণিমেলার ভাইবোনেরা বক্রেশ্বর, তারাপীঠ, শান্তিনিকেতন ঘুরে এল। এদের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়েছে। নবদ্বীপের বিদ্যার্থী মণিমেলার ষোড়শ বার্ষিক উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হল।

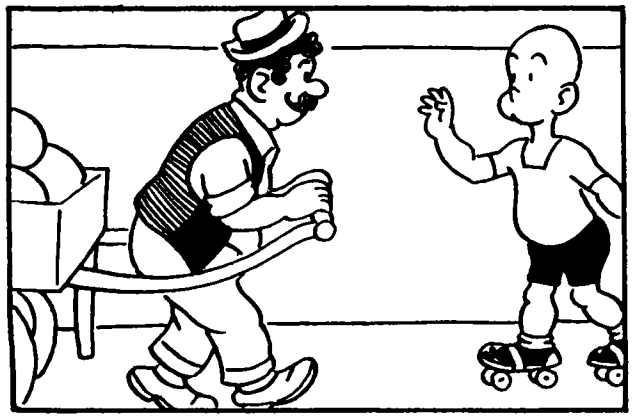

তরমুজ খাবে গাবলু?
তা বেশ তো, এক টুকরো
কেটে নাও।

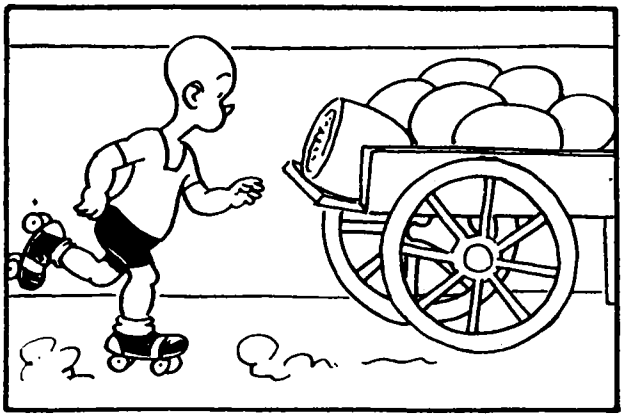

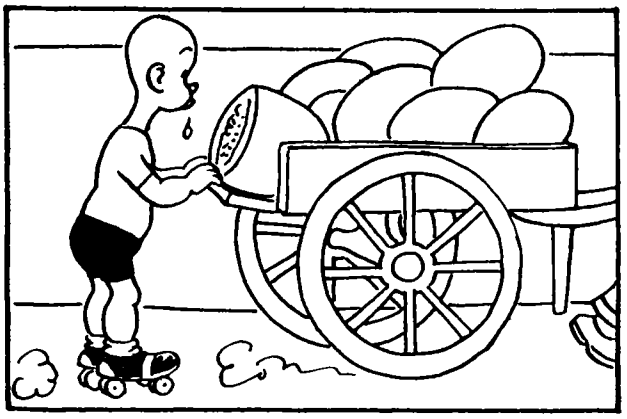

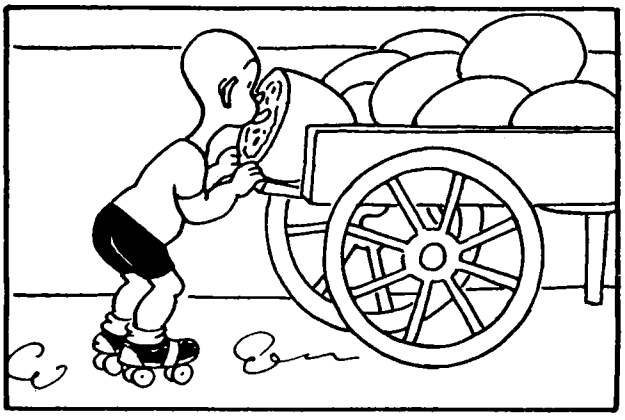

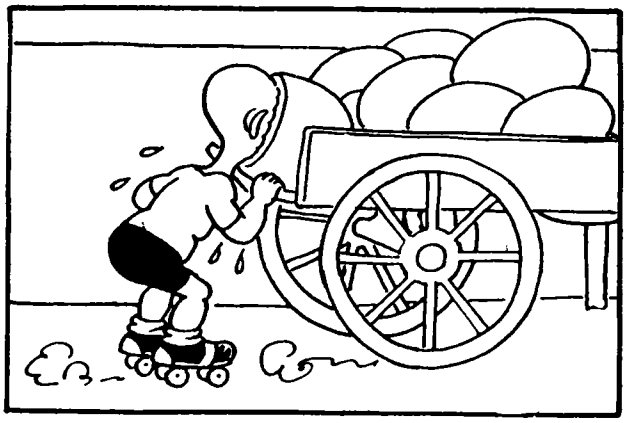

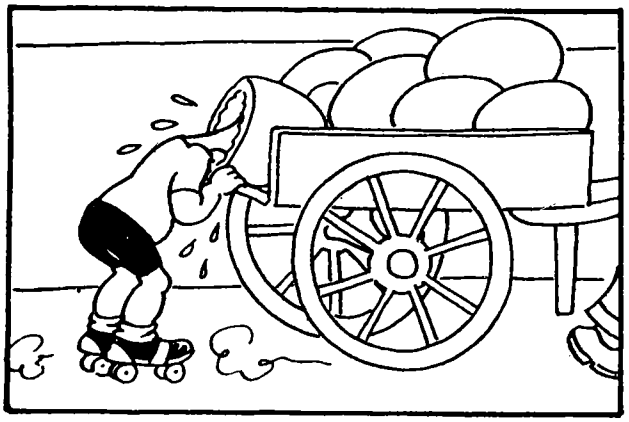

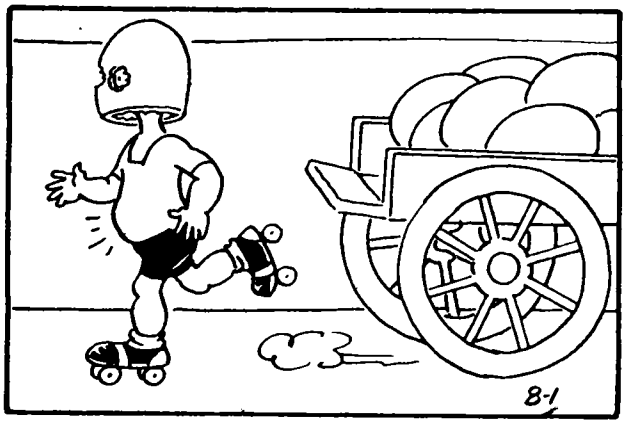
8-1

ডোডো তাতাই

লেখা/তারাপদ রায়
রেখা/কৃত্তিবাস রায়

গরমের ছুটির মধ্যে তাতাইবাবুর বাবা একদিন দুজনকে বললেন, "চলুন, আপনাদের কফি হাউসে নিয়ে যাই।" এখন ফুলপ্যান্ট পরলে তাতাইবাবু-ডোডোবাবুকে বেশ বড়-বড় দেখায়। দুজনে ফুল প্যান্ট পরে সেজে-গুজে কলেজ স্ট্রিট কফি হাউসে চললেন। তাঁদের কফি হাউসের সিঁড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে তাতাইবাবুর বাবা বললেন, "আমার একটা কাজ আছে এ পাড়ায়, আমি ঘুরে আসছি। এই তিনটে টাকা নিয়ে দোতলায় গিয়ে বসুন। ঠিকমত খরচ করবেন, দেখবেন খাওয়া-দাওয়ার পর পয়সা কম পড়লে তালা দিয়ে আটকে রাখবে।"

টাকা পেয়ে ডোডোবাবু-তাতাইবাবু উত্তেজিত হয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে কফি হাউসে ঢুকে পড়লেন। বাইরে থেকেই হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল, ভেতরে ঢুকে অবাক। শ দুয়েক লোক চেয়ার-টেবিলে বসে যে যার মত চেঁচাচ্ছে, কেউ কারও কথা শুনছে না এরই মধ্যে নির্বিকার উদাস মুখে কেউ-কেউ এক মনে খাবার খেয়ে যাচ্ছে। অনেক কষ্টে দুজনে মিলে একটা ফাঁকা টেবিল খুঁজে নিয়ে বসলেন। উর্দিপরা বেয়ারারা চার পাশেই। তারা ডোডোবাবুদের টেবিলে দু গেলাস জল রেখে গেল, কিন্তু খাবারের কথা জিজ্ঞাসা করে না। আসলে তারা ভাবছে এদের সঙ্গে বড় কেউ নিশ্চয়ই আছে, এসে গেলেই অর্ডার নেব, কিন্তু এরা যে স্বাধীন ভাবে এসেছে তা তারা বুঝবে কী করে। বুঝতে অবশ্য সময় লাগল না, একটু পরেই তাতাইবাবু অধৈর্য হয়ে পড়লেন, টেবিলে গেলাস বাজিয়ে বেয়ারাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগলেন। এবার একজন বেয়ারা এসে সন্দেহজনক চোখে তাঁদের দিকে তাকাতে তাতাইবাবু পকেট থেকে টাকা বের করে বললেন, "কী কী খাবার আছে?" বেয়ারা একটা পুরনো মেনু বের করে দিল। মন দিয়ে তাতাইবাবু-ডোডোবাবু সেটা দেখে হিসেব করে খাবারের অর্ডার দিলেন, দুটো কাটলেট। বাকি পয়সায় দুটো কোল্ড কফি হল না, একটা নিয়ে দুজনে ভাগ করে নিলেন।

ইতিমধ্যে তাতাইবাবুর বাবা এসে গেছেন, একটু দূরে অন্যদের সঙ্গে বসেছেন, সেখান থেকে হাত নেড়ে ডাকলেন। ডোডোবাবু-তাতাইবাবু বিল নিয়ে তিনবার যোগ পরীক্ষা করে পয়সা মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লেন। ওঠার সময় বেয়ারা বলল, "দেখুন, অনেকদিন কফি হাউসে আছি, কিন্তু আপনাদের মত ছোট ছেলেদের কখনো একা-একা এখানে আসতে দেখিনি।" ডোডোবাবু চটপট জবাব দিলেন, "আর দেখবেনও না, যা দাম এ-সব জায়গায়, তার থেকে রাস্তায় ফুচকা, ঝালমুড়ি খাব।"

ইডেনে সোবার্স

সুব্রত সরকার

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বলতে এতদিন আমরা টেস্ট ম্যাচই বুঝতাম। তবে এখন মনে হয় 'সুপার-টেস্ট'-এর যুগ আরম্ভ হতে চলেছে। আগামী নভেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বিশ্ব একাদশ বনাম অস্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবিত খেলাগুলি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে একটা খটকা লাগছে, সুপার-টেস্ট খেলার উপযুক্ত 'সুপার-ক্রিকেটার' কটিই বা আছে? অস্ট্রেলিয়া বা অবশিষ্ট দলে খুব ভাল খেলোয়াড় থাকবেন অনেকেই—সুন্দর ব্যাটসম্যান, দারুণ ফাস্ট-বোলার, নির্ভরযোগ্য অল-রাউন্ডার। কিন্তু গ্যারি সোবার্সের মতো সত্যিকারের অসাধারণ কোনো খেলোয়াড় খেলবেন না!

বছর তিনেক হল সোবার্স, এখন যিনি প্রকৃতরূপে স্যার গারফিলড সেন্ট অব্রান সোবার্স, টেস্ট প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এই জুলাই মাসের ২৮ তারিখে তাঁর ৪২তম জন্মদিন। সোবার্সের টেস্টে অনেক রেকর্ড আছে। যেমন, এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯ বছর আগে ৩৬৫ নট আউট, দেশের টিম থেকে বাদ না পড়ে একটানা সব থেকে বেশি খেলা (৮৫টি টেস্ট) বা টেস্ট ইতিহাসে সব চাইতে বেশি রান করা (৮,০৩২)। সব নিয়ে ৯৩টি টেস্টে তিনি করেন ২৬টি সেঞ্চুরি, তাছাড়া নিয়েছেন ২৩৫টি উইকেট আর ১২০টি ক্যাচ।

আমাদের দেশে সোবার্স শেষ খেলেছেন দশ বছর আগে। তবে ভারতবর্ষের অন্যান্য শহর থেকে কলকাতা সোবার্সের খেলা বেশি দেখার সুযোগ পেয়েছে। বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি জায়গায় সোবার্স শুধু সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সঙ্গে বার দুয়েক ঘুরে গেছেন, অথচ কলকাতায় তিনি এসেছেন সব মিলিয়ে চার বার।

সোবার্স প্রথম কলকাতার মাঠে খেলতে নামেন ১৯৫৯ সালের ১ জানুয়ারি। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের তৃতীয় টেস্ট ইডেন গার্ডেনসে আরম্ভ হয় ১৯৫৮ সালের শেষ দিনে।

ইডেনে সোবার্স

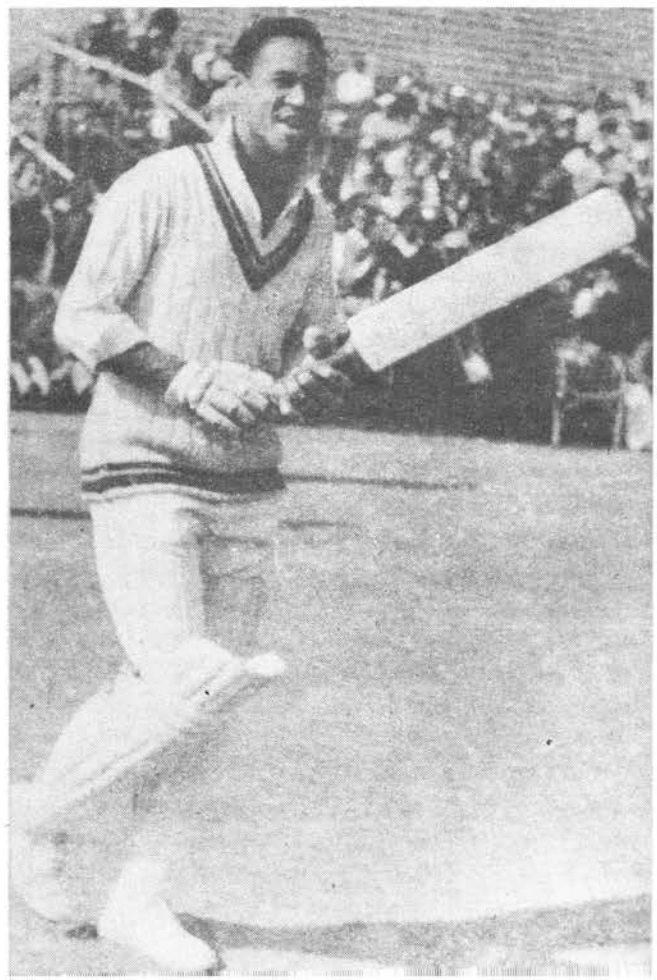

ইডেনে সোবার্স বলছেন, ছবি তুলো না। ছবি কিন্তু ঠিকই তোলা হয়েছিল।

সফরকারী দল ব্যাট করছে প্রথমে, সোবার্স তিন নম্বর নামবেন, প্যাড পরে প্রস্তুত। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রথম উইকেট পড়লে খেলতে নামেন রোহন কানহাই। তিনি দিনের শেষে ২০৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

সোবার্সের পেটের যন্ত্রণা ইনজেকশন দিয়ে কমানো হল। দ্বিতীয় দিনে ব্যাট করতে নামলেন ছয় নম্বর স্থানে। শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকায় তাঁর ফুটওয়ার্ক সব সময় নিখুঁত হয়নি। কিন্তু, ফাদকার, গোলাম আমেদ, গুপ্তের মতন বোলারদের বিরুদ্ধে অনায়াসে খেলে চা-বিরতির সময় যখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ডিক্লেয়ার করে, তখন সোবার্স ১০৬ রানে নট আউট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সহজেই ম্যাচ জেতে। ভারতের দুটি ইনিংসে সোবার্স কাঁ-হাতি স্পিন বল করে একটি করে উইকেট পান।

এর পর সোবার্স ইডেনে আবার খেলেন ১৯৬৪ সালের এপ্রিল মাসে। তখন প্রচণ্ড গরমে খেলছিল ইংরেজ সাংবাদিক জিম সোয়াণ্টনের পরিচালনায় কমনওয়েলথ দল কলকাতায় ভারতীয় একাদশের বিরুদ্ধে। খেলার প্রথম দিনে সোবার্স মারাত্মক সুইং বল করেন। বোলিং আরম্ভ করেন তিনিই, এবং প্রথম ইনিংসে ৬৩ রানের বিনিময়ে ছটি উইকেট পান। কমনওয়েলথ একাদশ ব্যাট করতে নেমে তিন উইকেটে মাত্র ৫৫ রান করে। তখন সোবার্স নামেন। তিনি বার্বাডোজের অপর খেলোয়াড় সীমোর নার্সের সঙ্গে ওই দারুণ রৌদ্রে ব্যাট করে দলের রান সংখ্যার সঙ্গে ১৮০ রান যোগ করেন। সোবার্স ১২৩ রানে আউট হন। ভারতীয় দলের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ৭৮ রানে আরও তিনটি উইকেট নেন। কমনওয়েলথ দল দ্বিতীয় ইনিংসে খুব দ্রুত রান তুলে ম্যাচ জেতে। নার্স আরেকটি শতরান করেন, আর সোবার্স খেলার শেষ কয়েক মিনিট ব্যাট করে সাত রানে অপরাজিত থাকেন।

সেই বছরই ডিসেম্বর মাসে সোবার্স তৃতীয়বার ইডেনে খেলেন, আর আবার শতরান করেন। মোহনবাগান ক্লাবের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আর এক কমনওয়েলথ দল কলকাতায় খেলতে আসে। ম্যাচ আরম্ভ হবার দিনই ভোর রাতে সোবার্স শহরে আসেন। কমনওয়েলথ দলের উভয় ইনিংসেই তিনি ছিলেন টপ-স্কোরার। রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীর দলের দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি পান ৯৪ রানে চারটি উইকেট আর স্মরণীয় এক ক্যাচ ধরে সুব্রহ্মনিয়মকে আউট করে দেন।

সোবার্স শেষবার এদেশে আসেন ১৯৬৬-৬৭ সালে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরকারী দলের অধিনায়ক হয়ে। ইডেনের সেই মাঠে খুব গোলমাল হয়েছিল, টেস্টে দর্শক-পুলিশ সংঘর্ষও হয়। চারবারের বার কিন্তু সোবার্স আর সেঞ্চুরি করতে পারেননি।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল ছিল ব্যাটসম্যানে ভর্তি। সোবার্স ব্যাট করতে নামেন পাঁচটি উইকেট পড়ার পরে। তবে মাত্র ৭৮ মিনিটে তাঁর ৭০ রানের ওই ইনিংসটিই ছিল ইডেনে তাঁর সব চাইতে উপভোগ্য ব্যাটিং। ভারত যখন ব্যাট করে সোবার্স প্রধানত ন্যাটা স্পিন বল করে প্রথম ইনিংসে ৪২ রানে তিনটি উইকেট আর দ্বিতীয় ইনিংসে ৫৬ রানে চারটি উইকেট পান। আট বছর আগের ইডেনের টেস্টের মতো এবারও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইনিংসে জয়লাভ করে।

সোবার্স অসাধারণ ফিল্ডিংয়েও। হলের (বা গ্রিফিথের) ফাস্ট বোলিংয়ে ব্যাট করছিলেন ভারতের ন্যাটা ব্যাটসম্যান রুসি সুর্তি, সোবার্স দাঁড়িয়েছিলেন স্লিপে। সুর্তির ব্যাটের একটি খোঁচায় বল স্লিপ-ফিল্ডারদের মাথার অনেক ওপর দিয়ে থার্ড-ম্যান বাউণ্ডারির দিকে চলে যায়। বলটি যখন বাউণ্ডারির মাঝপথ বরাবর মাটিতে পড়তে যাবে, দর্শকরা অবাক হয়ে দেখেন সোবার্স দৌড়তে দৌড়তে হাত বাড়িয়ে ক্যাচ ধরার চেষ্টা করছেন। হঠাৎ সোবার্স হোঁচট খান, এবং বলটি হাতে লেগে মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু একে কি কেউ ক্যাচ মিস বলবে? অনেক অসম্ভব ক্যাচ ধরার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন সোবার্স।

কলকাতার ইডেনে সোবার্স চারটি ম্যাচে করেছেন তিনটি সেঞ্চুরিসহ ৪৯১ রান (গড় ১২২·৭৫), আর নানা কায়দায় বল করে পেয়েছেন ২২টি উইকেট (গড় ২০·৪), চারবারই তাঁর দল জিতেছে।

আসন্ন সুপার-টেস্টের বাজারে সোবার্সের মতো একজন সুপার-ক্রিকেটারের অভাব ভীষণ চোখে লাগবে।

ফোটো/মনোজিৎ চন্দ

অদ্বিতীয় আলি

চিরঞ্জীব

ফুটবল, ক্রিকেট বা সব খেলাতেই দেখা যায় ত্রিশের কোঠাতেই সকলে অবসর নেন। ব্যতিক্রমও আছে। যেমন ফুটবলে স্ট্যানলি ম্যাথুস। চল্লিশে পড়েও দারুণ খেলতেন। বিশেষজ্ঞরা বলেন, নব্বই মিনিট ফুটবল খেলতে যে দম ও শক্তির দরকার, বক্সিংয়ে তার চাইতে অনেক বেশি দম ও শক্তি লাগে। তাই বক্সারদের লড়াই করার আয়ু খুব কম।

ব্যতিক্রম শুধু একজন। গোটা জীবনটাই তাঁর নাটকীয়। পৃথিবীতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন খেলায় যত খেলোয়াড় জন্মেছেন, এই খেলোয়াড়টি তাঁদের সকলের থেকে আলাদা। এখন পঁয়ত্রিশ বছরে পড়েও তিনি ক্লান্ত নন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরের ওজনও বেড়েছে, তবুও তাঁর কম বয়সীরা কিছুতেই এই বক্সারের ঘুষির সামনে দাঁড়াতে পারেন না। মহম্মদ আলি ওরফে ক্যাসিয়াস ক্লে মে মাসের লড়াই নিয়ে চুয়ান্নবার প্রমাণ করলেন যে, পৃথিবীতে তার মত মুষ্টিযোদ্ধা আর কেউ নেই।

ব্র্যাডম্যান, সোবার্স পরিচিত মাত্র পাঁচ-সাতটি দেশে, যেখানে ক্রিকেট খেলা হয়। ফুটবল খেলা পৃথিবীর সব জায়গায় হয় না, তাই পেলের ভক্ত সর্বত্র নেই। কিন্তু মহম্মদ আলি সর্বত্র পরিচিত। সাইকেল চোর ধরতে গিয়ে লুইসভিল কেন্টাকির যে বালকটির বক্সিংয়ের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সে যে পরবর্তী কালে সোনি লিস্টন, জো ফ্রেজিয়ারকেও হারাবে এ কথা কেউ কখনও ভাবতে পারেনি। বিশ্ববিখ্যাত এই বক্সারটির কিন্তু কথা আর কাজে দারুণ মিল।

মহম্মদ আলি এত বড় বক্সার হলেন কেমন করে? কিংবা কোন গুণে এতদিন ধরে শুধু জিতেই চলেছেন। (হেরেছিলেন শুধু দুবার—একবার ফ্রেজিয়ারের কাছে, আর একবার নর্টনের কাছে)।

কেউ কেউ বলেন, মহম্মদ আলি প্রতিটি লড়াইয়ের আগে নানারকম

বক্তৃতা দিয়ে দিয়েই কাবু করে ফেলেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে। বিপক্ষ বক্সার ওতেই অর্ধেক হেরে বসে থাকেন। আর বক্সিং রিংয়ে নেমেই আলি দ্রুত ঘুষি ছুঁড়ে কাবু করে ফেলেন প্রতিপক্ষকে। প্রতিপক্ষ প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ পর্যন্ত পায় না।

কিন্তু, নিজের সাফল্য সম্পর্কে আলি কী বলেন? ওঁর সাফল্যের জাদুটিই বা কী? তিনি বলেন, জয়ের পেছনে আছে, "আমার সাধনা, আমার অধ্যবসায় আর অমানুষিক পরিশ্রম।"

প্রকৃতপক্ষে মহম্মদ আলি এক-একটি লড়াইয়ের জন্য চার থেকে ছয় মাস সময় নেন। আর ওই সময়ে প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্র্যাকটিস রিংয়ে নানাভাবে অনুশীলন করেন। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিজেকে এগিয়ে নেন। এর মধ্যে একটুও গাফিলতি থাকে না, থাকে না আলস্য। আহার, নিদ্রা, ব্যায়াম, প্রত্যেকটির সঙ্গে প্রত্যেকটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

এসব তো গেল লড়াইয়ের আগের ব্যাপার। "আপনি রিংয়ে নেমে কীভাবে ওদের বলে-বলে হারান?"

আলির জবাব : সোনি লিস্টন থেকে এ পর্যন্ত যতজনকে হারিয়েছি, কৌশল ওই একটাই। আমি লক্ষ করি আমার প্রতিপক্ষ কেমনভাবে ঘুষি ছুঁড়ছে। দেখি কেমনভাবে ওর পা দুখানা চলাফেরা করছে। তবে আমার আসল লক্ষ্য—সে উপর্যুপরি কীভাবে ঘুষি ছুঁড়ছে সেদিকে। একজন হয়ত জ্যাব ছুঁড়ল। তারপর সে কী করবে? হুক, না আবার জ্যাব? না একটা আপার কাট? আপনারা হয়ত প্রশ্ন করবেন, এসবে ইতরবিশেষের কী আছে? তবে শুনুন—প্রত্যেক মানুষের মুদ্রাদোষ বা অভ্যাস বলে একটা জিনিস থাকে। আর তিনি তার পুনরাবৃত্তি করেই থাকেন। রিংয়ে নেমে ওই সব বিষয় আমি লক্ষ করি। আমি দেখি বিপক্ষ কী করছে। এ পর্যন্ত বেশিরভাগ লড়াই জিতেছি বিপক্ষের রণকৌশল দ্রুত বুঝেছি বলেই।

আর একটা বিষয়—বিপক্ষের ঘুষি আজও পর্যন্ত আমাকে বোকা বানাতে পারেনি। আমার ভাবনার বাইরে—এমন ঘুষি ওরা কেউ মারতে পারেনি। অবশ্য লামার ক্লার্ক আমাকে বেগ দিয়েছিল। ওকে দ্বিতীয় ব্রাউনডে নক আউট করেছিলাম। কিন্তু তার আগে ও আমার বুকের ডান দিকে প্রচণ্ড আঘাত করে। আমি ভেবেছিলাম পাঁজরা ভেঙে গেছে। ওই ব্যথা আজও মাঝে মাঝে অনুভব করি।

অদ্ভুত মানুষ এই মহম্মদ আলি। ক্ষণে-ক্ষণেই তিনি মত পালটান। তাঁর মতিগতি বোঝা দায়। এই তো কয়েক মাস আগে বলেছিলেন, "অবসর নিয়েছি, আর লড়াইয়ে নামব না।" ওঁর ঘোষণাটি অনেকেই বিশ্বাস করেনি। এবং দেখাও গেল যে, ১৬ মে আবার বিশ্ব হেভিওয়েট বক্সিং লড়লেন স্পেনের আলফেদো এভানজেলিস্তার সঙ্গে।

বক্সিং লড়াটা আলির এখন নেশা। উনি বলেন, "টাকার জন্যই লড়ি। আমার অনেক টাকা চাই।" অবশ্য একথা তিনি বলে আসছেন বক্সিং লড়ার শুরু থেকেই। এ পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ ডলার রোজগার করেছেন এবং তার বেশিরভাগ ব্যয় করেছেন ব্ল্যাক মুসলিমদের জন্য, কালো মানুষদের উপকারের জন্য।

"আচ্ছা কবে আপনি বক্সিং ছাড়বেন?" উত্তরে মনের কথাটি তিনি সম্প্রতি জানিয়েছেন, "যেদিন কেউ হারাবে। আর তখনই চলে যাব রোমে।"

"লুইসভিলে নয় কেন?"

ওঁর জবাব, "রোম অনেক সুন্দর। আর ওখানে ১৯৬০-এর ওলিম-পিকসে জিতেই তো আমার এই খ্যাতি। রোমকে ভুলি কেমন করে?"

বড় ফুটবলারদের কথা

মুকুল দত্ত

ফুটবল খেলায় যাঁদের বিশ্বজোড়া নামডাক—এখনকার আনন্দমেলার অল্পবয়সী পাঠকরা তাঁদের খেলা দেখার সুযোগ পায়নি। আমরা অবশ্য কিছুটা ভাগ্যবান। এই কলকাতার মাঠেই পৃথিবীর কিছু কিছু নামী ফুটবলারের চোখ-জুড়ানো খেলা দেখেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দেখেছি সুপ্রসিদ্ধ কার্টিস আর কম্পটনের খেলা। হ্যাঁ বিখ্যাত ক্রিকেটার ডেনিস কম্পটনের কথাই বলছি। ক্রিকেটে নাম করার আগে ফুটবলে তিনি বিশ্বখ্যাতি পান। ফুটবল খেলায় কম্পটন ছিলেন সৌন্দর্যের ছবি, যাকে বলে আর্টিস্টিক ফুটবলার। অতবড় ক্রিকেটার, কিন্তু ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবল খেলায় ছিল শিল্পের ছাপ বেশী। কার্টিস ছিলেন আরও বড় খেলোয়াড়। তখন ফুটবলে তো ইংলণ্ডেরই রমরমা। সেই ইংলণ্ডের সেণ্টার ফরোয়ার্ড। ১৯৪৫ সালের আই এফ এ শীল্ড ফাইনালে ইস্ট বেঙ্গলের বিরুদ্ধে এই কার্টিসকে মোহনবাগান দলে খেলানোর কথায় ফুটবল মহলে বেশ একটু সোরগোলও উঠেছিল। কার্টিস নিজে মোহনবাগানে খেলতে চেয়েছিলেন। খবরটা অবশ্য চাপাই ছিল। ফাইনাল খেলার দিন মোহনবাগান তাঁবুতে মিটিং শুরু হল বেলা দুটোয়। খেলা আরম্ভ হবার কথা ছিল বিকেল পাঁচটায়। তখন মোহনবাগান তাঁবু ছিল ইস্টবেঙ্গল তাঁবুর পাশে—এখন যেটা এরিয়ানের তাঁবু।

ইতিমধ্যে খবরটা ছড়িয়ে পড়েছে, কার্টিস ফাইনালে মোহনবাগান দলে খেলবেন। মিটিং হচ্ছে মোহনবাগান টেণ্টে। দুই তাঁবুর মধ্যে লোহার রেলিং ঘেঁষে যে কাঁঠাল গাছটা দাঁড়িয়ে আছে এবং যে গাছের কাঁঠাল পাকলে দুই ক্লাবের মালীরা ভাগজোগ করে খায়, আমরা কয়েকজন সাংবাদিক ও কিছু পুরনো খেলোয়াড় ওই গাছের নীচে দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। সবাই উৎসুক, কার্টিসের খেলা দেখব। ঠিক মনে নেই, বোধ হয় অতীতের নামী লেফট আউট সতু চৌধুরী হবেন—বলে উঠলেন, গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেল। মোহনবাগান খেলাবে কার্টিসকে? ডাঃ বসু কিছুতেই রাজী হবেন না।

সত্যিই তাই। সবাই প্রায় রাজী ছিলেন। বাদ সাধলেন মোহনবাগান ক্লাবের তখনকার সভাপতি, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের (তখন কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ) প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ এম এন বসু। একটু রক্ষণশীল ছিলেন। মোহনবাগানের ঐতিহ্য ভেঙে বিদেশী খেলোয়াড়কে খেলাতে রাজী হলেন না। ফাইনালে মোহনবাগান ০—১ গোলে হেরে গেল ইস্টবেঙ্গলের কাছে। তখনকার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড কার্টিস দর্শকদের আসনে বসে খেলাটি দেখেছিলেন। খেলার শেষে আমাদের কাছে বলেছিলেন, "জেতা ম্যাচ মোহনবাগান হেরে গেল। আমি অন্তত তিনটি গোল করতে পারতাম।"

যুদ্ধের সময় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই বিদেশের তা-বড় তা-বড় সব ক্রিকেট খেলোয়াড়, ফুটবল খেলোয়াড় সামরিক বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিলেন ইংলণ্ডের বহু নামী খেলোয়াড়। তাঁদের জড় করেই সার্ভিসেস দল গড়া হয়েছিল। আই এফ এ একাদশের সঙ্গে দুতিনটি প্রদর্শনী ম্যাচেই আমরা ওঁদের খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।

পরে আরও কিছু ডাকসাইটে ফুটবলারের খেলাও আমরা দেখেছি। যেমন সোভিয়েট ইউনিয়নের লেভ ইয়াসিন, ইগর নেট্টো, আনাতলী বাশাসকিনের খেলা। দেখেছি সুইডেনের হেলসিংবর্গ দলে অ্যাপলটণ্টের অসাধারণ খেলা। সেই আমরা প্রথম তিন-ব্যাক প্রথার খেলা দেখি এবং স্টপার হিসাবে অ্যাপলটণ্টের খেলা দেখে ফুটবলের প্রথাপ্রকরণ সম্পর্কে অনেকের মনে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। দেখেছি আরও কিছু কেষ্ট-বিষ্টুর খেলাও। চেকোস্লোভাকিয়ার পপলুহার এসেছিলেন স্লোভাকরাতিস্লাভা দলে, যিনি কয়েক মাস আগে বিশ্ব একাদশ দলের স্টপার ব্যাক হিসাবে খেলেছিলেন। রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে তাঁর খেলা দেখে সত্যিই আমাদের চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। কী চমৎকার পজিশন-জ্ঞান, আর কী ধীরস্থির তাঁর ক্রীড়াবিন্যাস। মনে হয়েছিল যেন চলমান পর্বতে প্রতিহত হয়ে সব আক্রমণ ফিরে আসছে। ১৯৬৪-র টোকিও অলিম্পিকের পর হাঙ্গেরির তাতাবানিয়া দলে সারনাই নামে যে সেণ্টার ফরোয়ার্ডটি এসেছিলেন, তাঁর গতির চমক এবং শটের জাদুও আমাদের চোখে যেন লেগে আছে। তারপর অনেকদিনই আমরা বিশ্বতারকাদের খেলা দেখার ব্যাপারে উপোসী।

এখন যারা কিশোর, তারা এ বছর সোভিয়েট ইউনিয়নের পাখতাকোর দলের কয়েকজন ভাল খেলোয়াড়ের খেলা দেখার অবশ্য সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আগে যাঁদের নাম করেছি, তাঁদের মত একজন খেলোয়াড়ও পাখতাকোর দলে ছিলেন না।

গত বছর আমরা সবাই উন্মুখ হয়ে ছিলাম ববি চার্লটনের খেলা দেখব বলে। কিন্তু ইংলণ্ডের ক্লুব টাউন দলের সঙ্গে তিনি কলকাতায় এলেন না। তাঁর বদলে মাত্র একটি খেলার জন্য এলেন টেরি পেন, যিনি ১৯৬৬-র বিশ্বকাপ জয়ী ইংলণ্ড দলের রিজার্ভ খেলোয়াড় ছিলেন। ৬৬ আর ৭৬-এর মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। তবু টেরি পেন যে উঁচু দরের ফুটবলার, একটি খেলাতেই তার প্রমাণ রেখে গেছেন। কিন্তু দুধের স্বাদ আমাদের ঘোলে মেটাতে হয়েছে। ববির বঞ্চনা আমরা ভুলতে পারিনি। টেরি আর ববির মধ্যে আকাশ-জমিন ফারাক। ববি ১০৬টি আন্তর্জাতিক খেলার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কষিত-কঞ্চন খেলোয়াড়—ফুটবলের কোন সম্মানই যাঁর পেতে বাকি নেই। আর টেরি—আগেই বলেছি, ইংলণ্ডের রিজার্ভ খেলোয়াড়।

ববি চার্লটন কত বড় খেলোয়াড়? এক নিশ্বাসে পৃথিবীর যে পাঁচ সাত জনের নাম উচ্চারিত হয়, তিনি তাঁদেরই একজন। খেলতেন ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডে। ওঁর দাদা জ্যাকি চার্লটন খেলতেন লীডস ইউনাইটেডে। ইংলণ্ড দলে খেলতেন দু ভাই এক সঙ্গে। ববি-জ্যাকি ফুটবলে জোড়া নাম, যেমন আমাদের কলকাতা ফুটবলের জোড়া নাম হাবিব-আকবর।

আগেই বলেছি, ফুটবলের কোন সম্মানই ববির পেতে বাকি নেই। ইংলণ্ডে লীগ চ্যাম্পিয়নশিপের পদক পেয়েছেন, এফ এ কাপ জয়ীর পদক পেয়েছেন, ইংলণ্ডে ফুটবলার অব দ্য ইয়ার হয়েছেন, ইউরোপের বেস্ট ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন, পেয়েছেন বিশ্বকাপ জয়ীর পদক। ফরোয়ার্ডে রাইট আউটের পজিশন বাদে যে কোন পজিশনে খেলতে পারেন সমান দক্ষতায়।

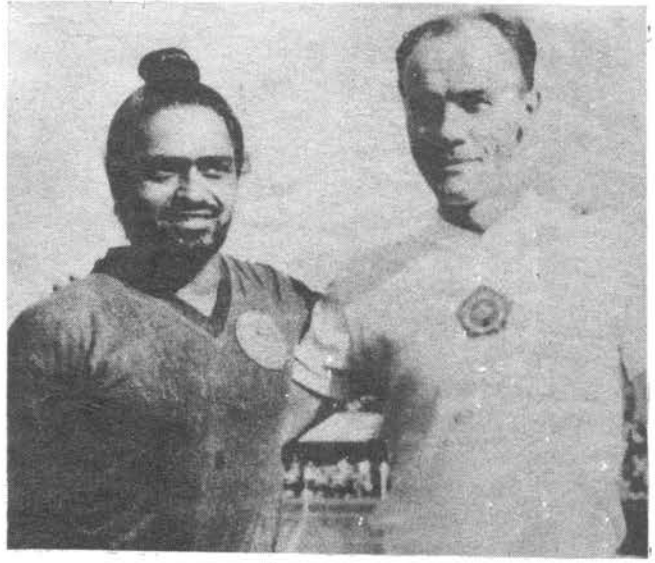

দুই অধিনায়ক, জার্মেল ও পপলুহার ফোটো/মানসিং চন্দ

প্রতিযোগিতামূলক ফুটবল খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন ১৯৭২ সালে। খেলা কিন্তু ছাড়েননি। এখনো—এই ৩৮ বছর বয়সেও প্রতি প্রদর্শনী ম্যাচে ওঁর ফি দু' হাজার পাউণ্ড—আমাদের টাকার হিসাবে প্রায় ৩৫ হাজার টাকা।

ববি চার্লটনের খেলা না দেখার নৈরাশ্য কি আমরা কিছুটা ভুলতে পারব বেকেনবাউয়ারের খেলা দেখে? অবশ্য পশ্চিম জার্মানির বিশ্বকাপ জয়ী দলের অধিনায়ক ফ্রানৎস বেকেনবাউয়ার যদি নিউইয়র্কের কসমস ক্লাবের সঙ্গে কলকাতায় খেলতে আসেন। আসার কথা সেপ্টেম্বর মাসে। ব্যাপারটা এখনো কিন্তু গাছে কাঁঠাল গোঁপে তেলের মত।

রাতের ফুটবল

পুষ্পেন সরকার

এ বছর কলকাতায় ফুটবল লীগ দারুণ জমজমাট। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোরটিং তিনটি দলই শক্তিশালী। কয়েকটি তরুণ দলও দারুণ খেলছে। কোন দল যে চ্যাম্পিয়ন হবে বলা খুব মুশকিল। সমর্থক ও সদস্যরা তাই প্রতিটি খেলায় মাঠে আসছেন। অসম্ভব ভিড়। গ্যালারিগুলো কানায় কানায় ভরা। মনে হয় রোজই চ্যারিটি ম্যাচ। তার উপর আবার এবার থেকে 'নাইট ফুটবল' হচ্ছে। সে তো আর এক বাড়তি আকর্ষণ।

গঙ্গার ধারে মোহনবাগান মাঠে যখন হ্যালোজেন আলোগুলো জ্বলে ওঠে তখন এক অপূর্ব দৃশ্য। স্কুল, কলেজ পালিয়ে বা অফিস ফাঁকি দিয়ে মাঠে আসার আর দরকার নেই। কাটফাটা রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা টিকিটের লাইনে দাঁড়াবার কষ্ট নেই। ধীরে-সুস্থে মাঠে এলেই চলবে। গঙ্গার ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে খেলা দেখা। খেলোয়াড়দেরও কষ্ট কমেছে। দিনের থেকে সন্ধ্যায় অনেক ভাল খেলতে পারবে, খেলোয়াড়দের এই আশা।

তবে এ বছর শুধু মোহনবাগান মাঠেই রাতে ফুটবল হবে। অন্য দুটি ঘেরা মাঠে এখনও আলোর ব্যবস্থা হয়নি। মোহনবাগান মাঠেও রোজ দুটি খেলা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। বিকাল ও সন্ধ্যায় রোজ দুটি খেলা এবং সকালে ক্লাবের অনুশীলন চললে মাঠের ক্ষতি হবে। মাঠেরও তো বিশ্রাম চাই।

কলকাতার অধিকাংশ দলের খেলোয়াড়দের বৈদ্যুতিক আলোয় খেলার অভ্যাস নেই। নতুন ব্যবস্থা, এ ব্যবস্থায় সুবিধা-অসুবিধা দুই-ই আছে। এই প্রসঙ্গে অনেককে প্রশ্ন করেছিলাম। কর্মকর্তা, কোচ, অধিনায়ক, সাধারণ খেলোয়াড় সকলেই ছিলেন এর মধ্যে। এমন কী, ফুটবলের উৎসাহী দর্শকদেরও মতামত নিয়েছি। দেখলাম, সকলেই 'নাইট ফুটবল' চান।

আই এফ এ সম্পাদক অশোক ঘোষও বলেন : ফ্লাডলিট ফুটবল আমি অবশ্যই চাই। ভারতের বাইরে প্রায় সকল বড় প্রতিযোগিতায় এমন কী ভারতেরও নানা জায়গাতে বৈদ্যুতিক আলোয় খেলার ব্যবস্থা আছে। বাংলায় খেলোয়াড়রা রাতে খেলায় অভ্যস্ত না হলে অসুবিধায় পড়বেন। খেলা এবং খেলোয়াড়দের শরীর, স্বাস্থ্য—সব দিক থেকেই রাতের ফুটবল কাম্য। তবে এখন একটি মাঠে খেলা হচ্ছে। সপ্তাহে দুটির বেশি খেলা দিতে পারছি না।" লোডশেডিং এবং যে দলগুলি খেলবে তাদের কমপক্ষে দুদিন অনুশীলনের সুযোগ ইত্যাদি সমস্যাও আছে। পুলিসের অনুমতিও পাচ্ছি না। তাই বড় তিনটি দলের খেলা দেওয়া যাচ্ছে না। তবে আই-এফ-এ শীল্ডের সময় যখন বাইরের দলগুলি কলকাতার বড় তিনটি দলের সঙ্গে খেলবে, তখন / আশা করি পুলিসের অনুমতি পাওয়া যাবে। কলকাতায় তিনটি ঘেরা মাঠে যখন আলোর ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হবে তখন খেলোয়াড়দের আর এই প্রচণ্ড তাপের মধ্যে খেলতে হবে না। বাংলার ফুটবলের মানও উঁচু হবে। বাংলার আরও অনেক খেলোয়াড় সারা ভারতে খ্যাতি লাভ করবে। এ কথা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি।

অতীতের দিকপাল খেলোয়াড় এবং মোহনবাগান ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা শৈলেন মান্নার অভিমত : অনেকদিন ধরে চাইছিলাম, সন্ধ্যার পর আলোতে খেলার ব্যবস্থা হোক। খুব খুশি হয়েছি। কলকাতার অসহ্য গরমে খেলোয়াড়রা অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠেন। সন্ধ্যার পর আবহাওয়া ঠাণ্ডা হবে। খেলোয়াড়দের দম থাকবে বেশিক্ষণ। ৯০ মিনিট খেলতে পারবে। অবশ্য এখন কিছু কিছু অসুবিধা আছে। যেমন কর্নার কিক যদি খুব উঁচু হয়ে আসে তাহলে গোলরক্ষক ঐ বল ভাল দেখতে পাবে না, সবুজ আসনের দিকে আলো কিছু কম। হয়ত সবুজ রংয়ে আলোর প্রতিফলন ঠিকমত হচ্ছে না। অবশ্য এই সব ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা কোন বড় সমস্যা নয়। 'নাইট ফুটবল' যে কোনো খেলোয়াড়ের বিরাট উপকার করবে। সকলেই আরও ভাল খেলবে।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কোচ অমল দত্তর বক্তব্য : মানুষ বাঁচে একটা তাপের মধ্যে। এই তাপ ৯৭ থেকে ১০৫ ডিগ্রি। বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে যদি শরীরের তাপের একটা সামঞ্জস্য থাকে তাহলে সেটাই হয় খেলোয়াড়দের খেলার উপযুক্ত তাপ। সন্ধ্যার পর আবহাওয়া কিছুটা শীতল হয়। শরীরের তাপের সঙ্গে অনেকটা মিল থাকে। আধুনিক ফুটবলে রক্ত হতে

ফোটো/মনোজিৎ চন্দ

গেলে সন্ধ্যার পর অবশ্যই খেলার ব্যবস্থা করতে হবে।

তবে বর্তমান আলোর ব্যবস্থায় কিছু পরিমার্জন প্রয়োজন আছে মনে করি। সবুজ আসনের দিকে আলোকস্তম্ভ দুটি মাঠ থেকে দূরে সরিয়ে নিতে হবে। তাহলে ছায়া কম পড়বে। সমস্ত গ্যালারির রং সাদা হলে আলো খুলবে আরও বেশি। গোলের ঠিক পিছনে ২৪ ফুট লম্বা ও ৮ ফুট উঁচু সাদা রং দিয়ে একটা কাঠের বোর্ড লাগালে খেলোয়াড়দের গোল নিশানা আরও নির্ভুল হবে। বর্ষার মধ্যে যখন খেলা চলবে তখন এই আলো যথেষ্ট হবে কি না পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। বর্ষায় আলো ঝাপসা হয়ে গেলে জলকাদায় মাখা খেলোয়াড়দের পরস্পরকে চিনে নিতে অসুবিধে হতে পারে। বল যত সাদা হবে ততই খেলোয়াড়দের সুবিধে।

প্রখ্যাত কোচ অরুণ ঘোষ জানালেন : মোহনবাগান মাঠে উত্তর-পূর্ব কোণে আলো কম। সবুজ আসনের দিকে আলোকস্তম্ভ আরও দূরে না সরালে খেলোয়াড়দের ছায়া পড়ার সমস্যা থেকে যাবে। বিশেষ করে গোলরক্ষকের সামনে যখন দু দলের অনেকগুলি খেলোয়াড় নড়াচড়া করছে, তাদের ছায়াগুলি গোলরক্ষকের মন-সংযোগে অসুবিধে ঘটাবে। আলোতে অভ্যস্ত হতে খেলোয়াড়দের বেশি সময় লাগে না। আমরা ভারতের বাইরে এবং ভারতে যে সব জায়গায় রাতে খেলেছি, দু-চার মিনিটেই নিজেদের ঠিক খাপ খাইয়ে নিয়েছি। মার্ডেকা ফুটবলে যে আলোতে খেলেছি তার চেয়ে, এমন কী আরও অনেক জায়গার থেকে, মোহনবাগান মাঠে আলোর ব্যবস্থা ভাল। রাতে খেললে খেলোয়াড়দের সব দিক থেকেই মঙ্গল হবে।

অতীতের প্রখ্যাত খেলোয়াড় বাঘা সোম বলেন : ফুটবলে উন্নত দেশগুলিতে 'নাইট ফুটবল' খেলা হয়। আমাদের অবশ্যই এ ব্যবস্থা করতে হবে। খেলোয়াড়দের খেলার মান উন্নত করতে এবং স্বাস্থ্য অটুট রাখতে 'নাইট ফুটবল' সকলেই চাইবে।

এরিয়ানের অশোক মিত্রের (নন্টু) বক্তব্য : যে খেলোয়াড় তিন বছর টপ ফর্মে খেলত, সে রাতে ফুটবল খেললে সাত আট বছর নিজের খেলার উন্নত মান বজায় রাখতে পারবে। দম অনেক বেশি পাবে। খেলাও ভাল হবে।

সালকিয়া ফ্রেন্ডসের নরনারায়ণ চ্যাটার্জির অভিমত : খেলোয়াড়দের সকলের পক্ষেই 'নাইট ফুটবল' আশীর্বাদ স্বরূপ। দর্শক সংখ্যাও বাড়বে। দর্শকরাই খেলোয়াড়দের অনুপ্রাণিত করে। বিশেষ করে আমাদের মত তরুণ খেলোয়াড় নিয়ে গড়া দলগুলি দর্শকদের কাছ থেকে উৎসাহ পেলে আরও ভাল খেলবে।

এ ছাড়া বড় দল মহমেডান স্পোরটিং থেকে শুরু করে লীগের অন্যান্য সমস্ত দলই 'নাইট ফুটবল' খেলতে চায়। তবে তরুণ দলগুলি বিশেষ করে যারা আগে কখনও আলোতে খেলেনি, তারা খেলার আগে দু একদিন অনুশীলনের সুযোগ আশা করেন। যে দলগুলি অনুশীলনের সুযোগ পেয়েছে বা খেলেছে তাদের মধ্যে দু চারজনের বক্তব্য, খেলোয়াড়দের ছায়া অসুবিধা ঘটায়। বিপক্ষ খেলোয়াড় হয়ত বেশ দূরে কিন্তু তার ছায়া দেখে মনে হয়, খুব কাছে এসে পড়েছে। তবে এ সব বাধা ওরা কয়েকদিনের মধ্যেই কাটিয়ে উঠতে পারবে আশা করে। সব শ্রেণীর দর্শকও চান 'নাইট ফুটবল।

টাকার খেলা ক্রিকেট?

বিনা মেঘে বজ্রপাত!

মে মাসের ৯ তারিখে শোনা গেল সেই 'দুঃসংবাদ।' আগামী নভেম্বর থেকে ১৯৭৮-এর ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় একটি সুপার টেস্ট সিরিজের ব্যবস্থা পাকাপাকি। বাছাই বিশ্ব দল বনাম অস্ট্রেলিয়া। বিশ্ব দলে ভারত আর নিউজিল্যান্ড বাদে আর সব দেশের নামী ক্রিকেটাররা। অধিনায়ক ইংলণ্ডের টনি গ্রেগ। অস্ট্রেলিয়ার তালিকাতেও বিখ্যাত সব খেলোয়াড়। মোট ৩৫ জনই চুক্তিবদ্ধ। অনেক খরচ হবে—প্রায় পঁচিশ লাখ ডলার। প্রতি টেস্টে বিজয়ী দল পাবে প্রায় ন' লাখ টাকা। এ ছাড়া খেলোয়াড়দের আলাদা টাকা তো আছেই। এত টাকার ঝুঁকি নিচ্ছে কে? অস্ট্রেলিয়ার একটি টেলিভিশন সংস্থার মালিক। কোটিপতি। নাম কেরি প্যাকার।

সর্বনাশ! বিশ্বের টেস্ট ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। ঐ চার মাসে চারটে সরকারী টেস্ট সিরিজ চলার কথা। যার একটি ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফর। দুই ক্রিকেট বোর্ডই উদ্বিগ্ন। ভারতের বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়ার কারা খেলবেন? দ্বিতীয় দল না তৃতীয়?

আসল সমস্যাটা কিন্তু আরও বড়। এই মুহূর্তে সবাই সেটা নিয়েই ভাবছে। তা হল টেস্ট ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ। ক্রিকেট নিয়ে ধনকুবেররা যদি

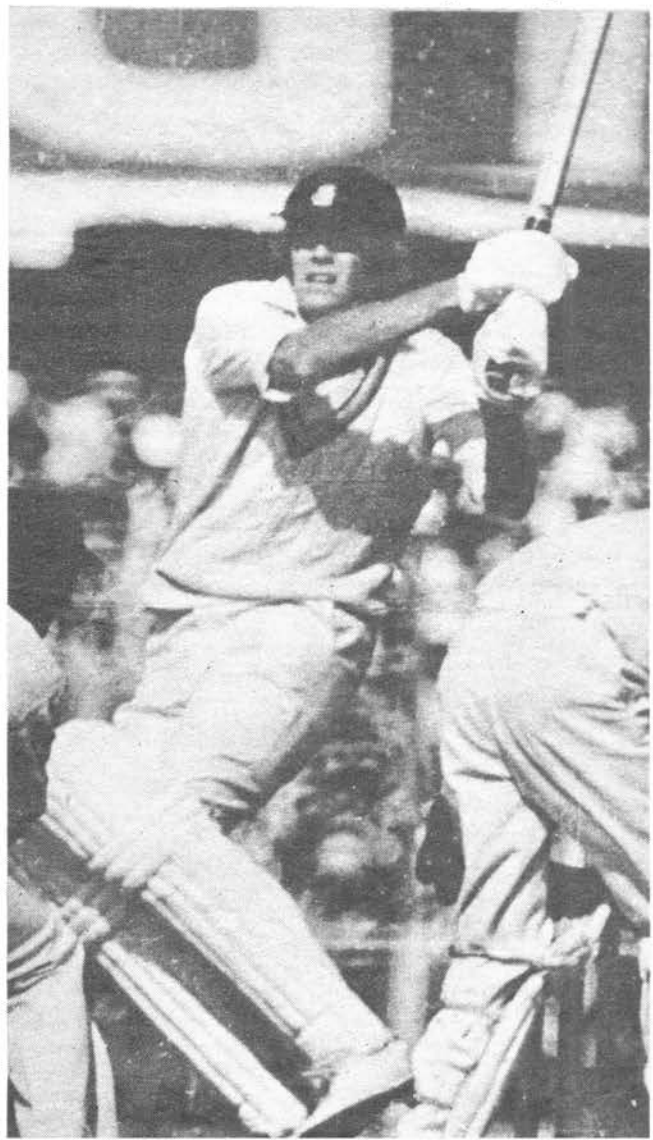

টোনি গ্রেগ ফোটো/মনোজিৎ চন্দ

এভাবে ব্যবসা শুরু করে দেয় তাহলে আর কোনও দিন টেস্ট ক্রিকেট হবে কি! পৃথিবীতে একাধিক প্যাকার আছেন, তাঁদের সম্পদেরও সীমা নেই। তাহলে টেস্ট ম্যাচ খেলার জন্যে ভাল খেলোয়াড় আর পাওয়া যাবে না। তবে তো ক্রিকেটের শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর! খেলার আয়োজন করবে ক্রিকেট বোর্ডগুলি নয়, গোষ্ঠীরা। বিস্ময় এবার রূপান্তরিত হল ক্রোধে। প্রস্তাবিত সিরিজকে কর্তৃপক্ষরা বলতে লাগলেন 'ক্রিকেট সার্কাস'। কেউ বললেন, পুতুলনাচ। কেউ বা বললেন 'ক্যু', কেউ বললেন ডাকাতি। সকলেই এক-মত—এটা জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা। একজন তো লন্ডনের টাইমস পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলেন শোক - সংবাদের আকারে। ৯ মে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে। ক্রিকেট অনুরাগীরা শোকাচ্ছন্ন। সৎকারের পর ক্রিকেটের ভস্ম ছড়িয়ে দেওয়া হবে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে। টি সি এন ৯ স্টুডিওর (প্যাকারের টি ভি স্টুডিও) চারদিকে!

সকলের রাগ এবং ঘৃণা গিয়ে পড়ল প্যাকার আর গ্রেগের ওপর। গ্রেগকে এক কথায় অধিনায়কের আসন থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। অভিযোগ, তিনি ইংল্যান্ডের বোর্ডকে না জানিয়ে প্যাকারের সঙ্গে চুক্তি করেছেন। খেলোয়াড় সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁর সহায়তা করেছেন। গ্রেগ কিন্তু দমবার পাত্র নন। বললেন, আমার অধিনায়কত্ব চলে যাবে, এ তো আমি জানতাম। আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। তার জন্যে আমি গর্বিত। ক্রিকেটাররা গলফ, টেনিস ইত্যাদি খেলার পেশাদারদের মত পয়সা পায় না। তারা যাতে দুটো পয়সার মুখ দেখে সেইজন্যেই তো এই সব করা হচ্ছে। তা, এতে অন্যায়টা কোথায়? ক্রিকেট বোর্ডেরই উচিত প্যাকারের সঙ্গে কথা বলা। সরকারী টেস্ট সিরিজের সঙ্গে যাতে সুপার টেস্টের সংঘর্ষ না হয়।

বলা বাহুল্য, প্যাকারের মতও তাই। নামকরা মাঠগুলি না দেবার হুমকিও তাঁকে টলাতে পারছে না। তিনি বলেছেন, তাহলে অন্য মাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। প্যাকারের পক্ষে যে কেউ কথা বলছেন না তা নয়। গ্রেগ, ইয়ান চ্যাপেল, আসিফ ইকবাল, অ্যালান নট, এঁরা যে প্যাকারকে সমর্থন করেছেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ওয়েস্ট ইন্ডিজ বোর্ডের সভাপতি ও একদা বিখ্যাত জেফ স্টলমেয়ারও প্যাকারের অনুকূলে কথা বলেছেন।

তা হলে এখন উপায় কী? সকলেরই মত, আন্তর্জাতিক ক্রিকেট সম্মেলনের (আই সি সি) সভায় ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা হোক। কিন্তু সে তো জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে। অত ধৈর্য কারও নেই। তাই জরুরী সভা ডাকা হল ২৪ জুন। সিদ্ধান্ত অবশ্য জুলাইয়ের সভাতেই নেওয়া হবে।

কিন্তু তখনই কি ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটবে? এ-অবস্থা তো আর রাতারাতি সৃষ্টি হয়নি। অনেকদিন আগেই ক্রিকেট টাকার বশ হয়ে গেছে বললে খুব ভুল বলা হবে কি? পেশাদার লেন হাটনকে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক করার সময় মৃদু গুঞ্জন উঠেছিল মাত্র। তারপর এজেন্ট ও প্রোমোটারের দল ক্রিকেটকে কামধেনু করে নিয়েছেন। টেলিভিশন, রেডিও সাক্ষাৎকারের জন্যে মোটা টাকা দেয়, টাকা দেয় সংবাদপত্র ও প্রকাশন সংস্থাগুলি। বিশেষ বিশেষ পণ্যের বিজ্ঞাপনেও ক্রিকেটাররা টাকার বিনিময়ে তাঁদের ছবি বা নাম ব্যবহার করতে দেন। এ-সব বিষয়ে তাঁদের বড় একটা অনিচ্ছাও দেখা যায় না। যেমন দেখা যায়নি বর্তমান সংকটে। 'ডেলি মেল'-এর ক্রিকেট সমালোচক ইয়ান উলরিজ বলেছেন, এরকম একটা ব্যাপার যে এতদিন ঘটেনি, সেটাই আশ্চর্য। কথাটা ঠিক। গিলেট কাপ, জন প্লেয়ার লীগ, বেনসন অ্যান্ড হেজেস কাপ, প্রুডেন্সিয়াল ট্রফি, প্রুডেন্সিয়াল (ওয়ার্ল্ড) কাপ ইত্যাদি এক-দিনের ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আর্থিক সাফল্যে ব্যবসায়িক সংস্থা-গুলির উৎসাহিত হবারই কথা।

সন্দেহ নেই, যদি শেষ পর্যন্ত সুপার টেস্ট সিরিজ খেলা হয়, দলে দলে দর্শক ছুটবে তারকার মেলা দেখতে। স্বয়ং নট-ই বলেছেন, দুনিয়ার সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান ব্যারি রিচার্ডের সঙ্গে লিলি আর টমসনের মোলাকাত দেখার জন্যে আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

সাধারণ দর্শকের মনোভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

তবু টেস্ট টেস্টই। ক্রিকেট টেস্ট খেলার মূল কথা যে দু' দেশের প্রতিযোগিতা, সেটা না থাকলে আসর জমবে কী করে? দেশের সম্মানের জন্যে লড়াই—অ্যাসেজ কি রাবারের জন্যে—সে একটা আলাদা ব্যাপার। কাজেই, সুপার টেস্টকে ভয় করার কিছু নেই, এ-কথা অনেকে বলছেন। আর একটা কথাও বলা হচ্ছে। ক্রিকেটারদের খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা সব কিছুর মূলে কি তাঁদের দেশের টেস্ট দলে স্থান পাওয়া নয়? সুতরাং তাঁরা নিশ্চয়ই আবার চিন্তা করবেন। তাই, ক্রিকেট এ-চ্যালেঞ্জ নিক। কিন্তু ভরসাই বা কোথায়?

বজ্রসেন

শিল্পী—মুনমুন দাশ (বয়স ১০)

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি অক্ষর দিয়ে নকশা করার ধরনটা। একবার ছিল 'ল', এবার 'অ'। একটু ভাবলেই আমার আঁকা নমুনার থেকেও মজার আকার এসে হাজির হবে কাগজের ওপর। নানান রঙে [illegible] একে আরও জ্বলজ্বলে করে ইচ্ছেমত [illegible] [illegible], সেখানে যেমন দরকার।

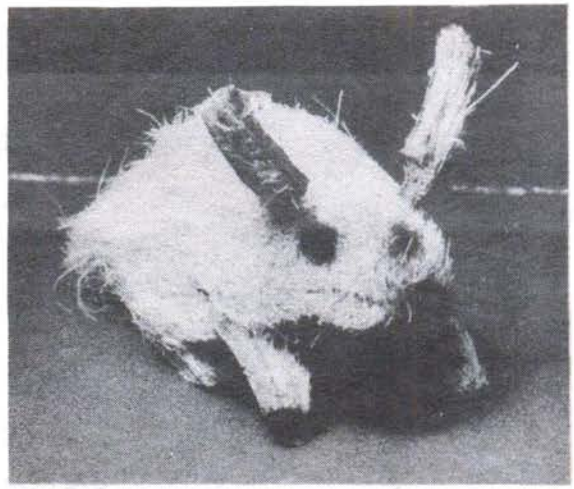

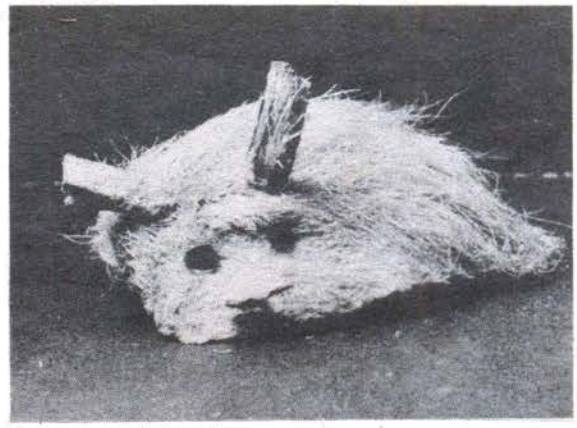

কারিগর

এবার যে জিনিস শিখতে যাচ্ছ তার জন্যে জোগাড় করো—তালের আঁঠি। ছোট করাত, ছুরি, চিরুনি, মাঝারি মুখ সরু লোহার ছোট ছড় আর রং-বেরঙের পুঁতি ও বোতাম।

শুরু করো। রস-টেনে নেওয়া শুকনো আঁঠিগুলো বেশ ভাল করে জলে ধুয়ে চুনের জল বা পারলে ব্লিচিং পাউডারের জলে ডুবিয়ে রেখে পরের দিন তুলে ভালভাবে ধুয়ে নিলেই দেখবে বেশ ধবধবে হয়ে উঠেছে। ভেজা আঁঠি ভালমতো শুকিয়ে মোটা দাঁতের চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে আঁশগুলো ঝকঝকে করে নাও।

এবার ইচ্ছে করলে গোটা, বা করাত দিয়ে অর্ধেক করে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমার ইচ্ছেমত ভেবে-পাওয়া আকার অনুযায়ী ওদের চোখ-মুখ-হাত-পা দিয়ে সচল করো। এখানে দেওয়া নমুনা তোমায় এ-বিষয়ে সাহায্য করবে।

চোখ-মুখ এঁকে করলে আরও সুন্দর-ভাবে হবে। লোহার ছড়ের সরু দিকটা গরম করে চোখ-মুখ-কানের ফুটো অনায়াসে করতে পারো এখানকার নমুনার মত।

জন্তুর, ছোট-ছোট হাত-পা-লেজ লাগাবার উপায় হল হিসেব-মতো নীচের দিকে আড়াআড়িভাবে কেটে তাতে তোমার তৈরি হাত-পা গুঁজে দিলেই থেকে যাবে। এমন ভাবেই নানান জন্তু-জানোয়ার বা মানুষের অবাক-করা হাসিভরা দুঃখে-কাঁদা মুখ করতে পারো।

জেনে রাখো! • (১) আঁঠি নানান রঙে ছুপিয়ে নিতে পারা যায়। (২) চুনের জলে চুনের ভাগ বেশি না থাকে। (৩) গায়ের আঁশ থাক-থাক করে কেটে জন্তুর লোমে-ভরা শরীর করতে পারো। (৪) ফুটো চোখের মধ্যে পুঁতি বসালে আরও জ্বলজ্বল করবে। (৫) ছড় গরম করে চোখ বা মুখ করার সময় সাবধান। চাপ দেবার সময় আস্তে দেবে যাতে ফসকে না যায়। (৬) কয়েকটি আঁঠি জুড়ে কাজ করতে পারো।

আইকম বাইকম তাড়াতাড়ি
যদু মাষ্টার শ্বশুর বাড়ি
রেল কম ঝমাঝম
পা পিছলে আলুর দম

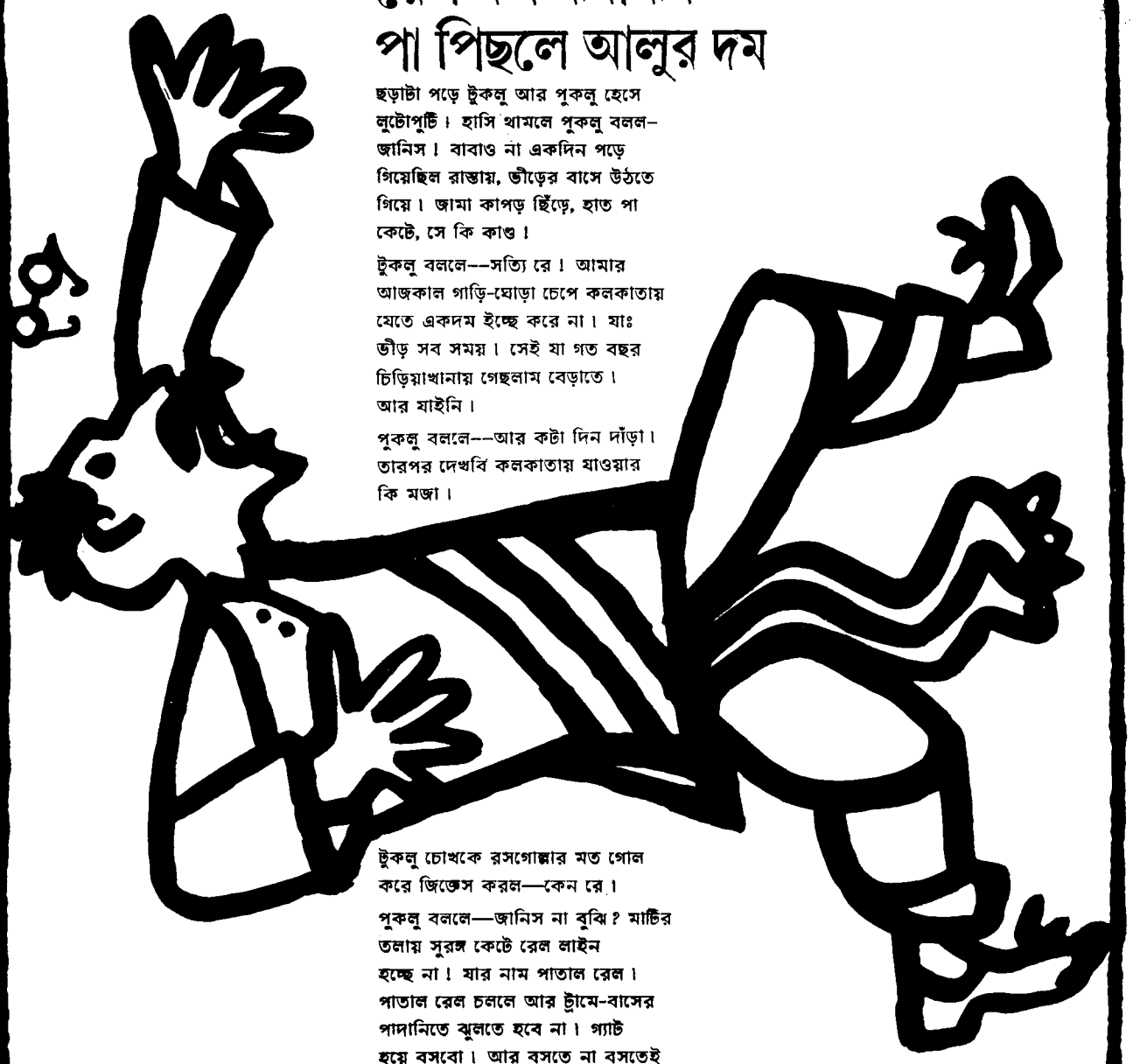

ছড়াটা পড়ে টুকলু আর পুকলু হেসে লুটোপুটি। হাসি থামলে পুকলু বলল– জানিস। বাবাও না একদিন পড়ে গিয়েছিল রাস্তায়, ভীড়ের বাসে উঠতে গিয়ে। জামা কাপড় ছিঁড়ে, হাত পা কেটে, সে কি কাণ্ড।

টুকলু বললে––সত্যি রে। আমার আজকাল গাড়ি-ঘোড়া চেপে কলকাতায় যেতে একদম ইচ্ছে করে না। যাঃ ভীড় সব সময়। সেই যা গত বছর চিড়িয়াখানায় গেছলাম বেড়াতে। আর যাইনি।

পুকলু বললে––আর কটা দিন দাঁড়া। তারপর দেখবি কলকাতায় যাওয়ার কি মজা।

টুকলু চোখকে রসগোল্লার মত গোল করে জিজ্ঞেস করল—কেন রে।

পুকলু বললে—জানিস না বুঝি? মাটির তলায় সুরঙ্গ কেটে রেল লাইন হচ্ছে না। যার নাম পাতাল রেল। পাতাল রেল চললে আর ট্রামে-বাসের পাদানিতে ঝুলতে হবে না। গ্যাট হয়ে বসবো। আর বসতে না বসতেই পৌঁছে যাবো ফুরুৎ করে।

MTP মেট্রোপলিটান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট (রেলওয়েজ)

medium

ANANDAMELA Regd. No. [illegible] 264
আনন্দমেলা । জুলাই ১৯৭৭ । [illegible] টাকা

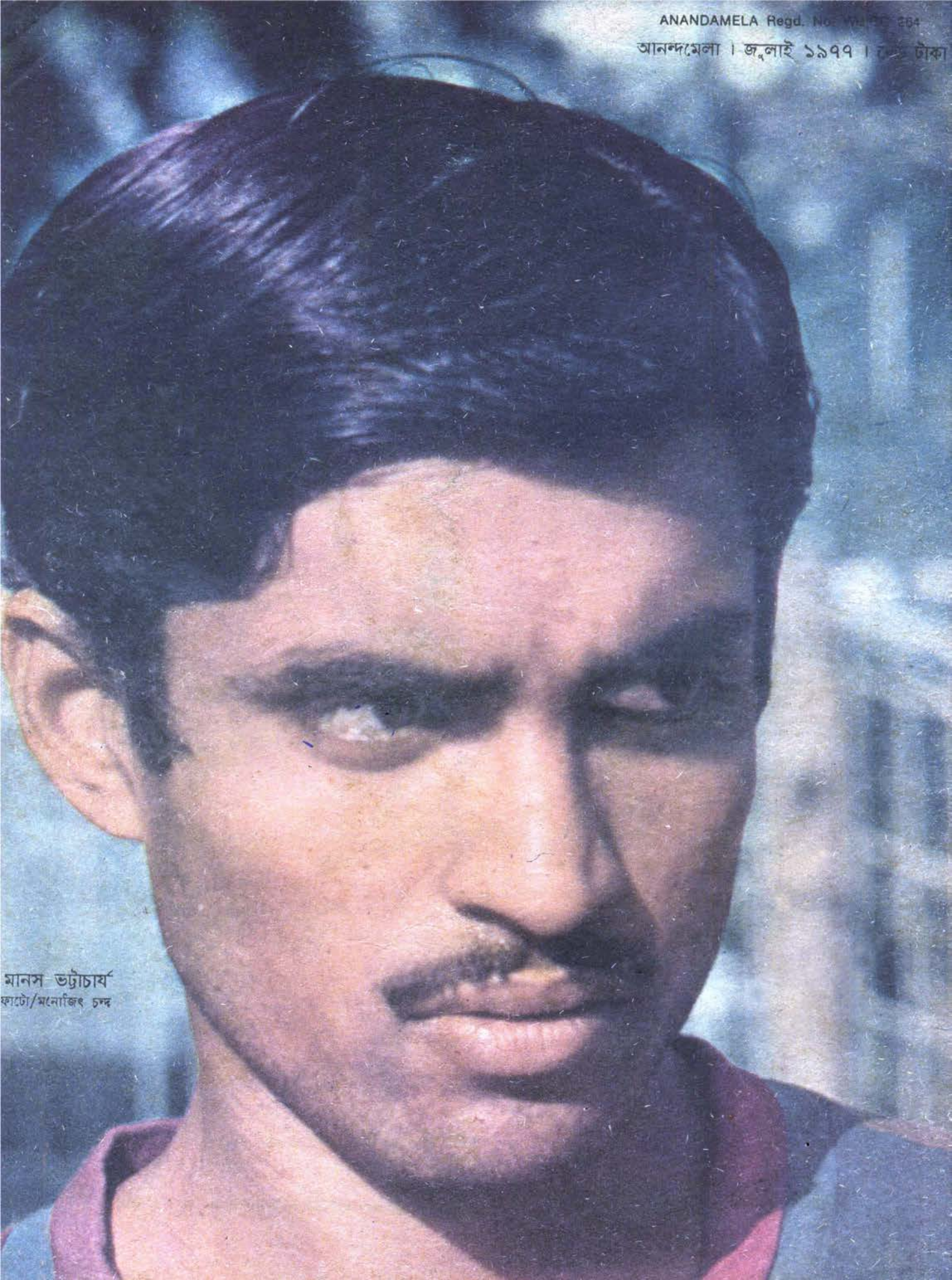

মানস ভট্টাচার্য
ফোটো/মনোজিৎ চন্দ